
কাকতাড়ুয়া
অনুপম দত্ত

কাকতাড়ুয়া

অনুপম দত্ত

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন
৫০ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীহিরণ মুখোপাধ্যায়
৫০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১৩৯৪

প্রচ্ছদ
শতদল ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর
রায়চন্দ্র দাস
শিব শঙ্কর প্রেস
৪৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

এই বই

তোমাকে 'নন্দন'

বাঁচতে চেয়েছিলে কিন্তু পাও নি।

মানুষের হিংসা

তোমার মত যত কিশোর হত্যা করেছে

তুমি তাদের একজন। আমি কাকতাড়ুয়া

হয়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছি। সেই

কল্প কহিনী তোমারই প্রাপ্য।

অনুপম দত্ত।

এই লেখকের

[জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত]

[ভারত সরকার কর্তৃক বয়স্ক শিক্ষার 'উপন্যাস' রচনায় যথাক্রমে ১৯৮৩, ও' ৮৪ সালে পরপর দু'বার]

- মাছের খেলা : সাধনা পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী
- দুপুরের সূর্য : নিউদিল্লী

[কিশোর উপন্যাস]

- ছিল তিন রাজকুমার : আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, কলকাতা
- জলজ উভচর : আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, কলকাতা
- স্মৃতি ফলক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় এক অনবদ্য, বর্তমান কালের কিশোর চেতনার উপন্যাস [যন্ত্রস্থ]
- উৎস পুরুষ : শিক্ষানিকেতন কলিকাতা

লেখকের কথা

গ্রামে, মাঠ পাহারায় থাকে যে কাকতাড়ুয়া তেমন একটি জড়বস্তুর মধ্যে জেগে উঠল চেতনা। সে শুরু করল ভাবতে। ভাবল তার অতীতের কথা। কিছু সুন্দর দিন, দুঃখের রাত। এসব কথার কিছু সে বলল চাঁদকে আর কিছু বলল এক কিশোরকে। বাকীটা সে দেখল স্মৃতির ছবিতে।

কিন্তু স্মৃতি, যা অতীত, সেটা চলমান জীবন নয়।

আর এই কাকতাড়ুয়া যখন জীবন্ত তখন তার চারিদিক ঘিরে বর্তমানের নানা ঘটনা পাক খেয়ে উঠল।

সেই সব ঘটনার একটি চূড়ান্ত সময়ে হত্যাকারীদের হাত থেকে সে বাঁচালো একটি কিশোরকে। যার নাম নন্দন।

কিন্তু কাকতাড়ুয়ার ভূমিকা, একদিন তারই স্বপ্নের মত, যথার্থ অর্থে হয়ে গেল সভ্যতার প্রহরী।

লেখকটির এই নামই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এটি একটি কিশোর উপন্যাস।

আর আমি যে রকম করে ভাবি, চিরকালের কিশোর বয়স-কল্প-জগত প্রিয় সহানুভূতি কাতর। ও ভাবুকতার জন্মকাল।

এই বিশ্বাসে, বাচ্চাদের জন্যে নয়, কিশোর বয়সের জন্যে এসেছে চাঁদ-বাঁদর-ছাগল-কুকুর-শেয়াল-শালিক-বক-কাক-ঝিঁ ঝিঁ পোকা-মাকড়সা-জোনাকী-গুটিপোকা। এরা আকাশে কাকতাড়ুয়ার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে যুক্তিগ্রাহ্য সহায়তা দিয়েছে।

বর্তমানকালের কিশোর বয়স যুক্তিবাদী কল্পনাচারী। তাই তাদের দরবারে এই "গপ্‌প,' ও তার চরিত্রদের হাজির করলাম।

গা শির্‌শিরে এ্যাড্‌ভেঞ্চার বা লোম-খাড়া ডিটেকটিভ ঘটনার

শ্বাসরুদ্ধ কোন ব্যাপার এতে নেই, আছে একটি ফ্যান্টাসির জগত। কিন্তু সেটি বাস্তব বিমুখ নয়। আর আছে কি বলতে চাওয়া যা একটি কাকতাড়ুয়ার প্রতীকে ছড়ানো ছেটানো আছে কাহিনীর ঘটনায় ও সংলাপে।

এইসব কোথাও, কোনও, কোন হৃদয় ছুঁলে এ লেখকের প্রত্যাশা সফল হবে। ইতি।

অনুপম দত্ত,

এখন কী ভীষণ মেঘ করেছে। যেন একটা কালো শেলেটে চারদিক ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে না। বাজ পড়ছে না কানে তালা লাগিয়ে। যেন থম্‌থম্ করছে গভীর রাতের চুপচাপ! কিন্তু চুপচাপ নেই। ভয়ঙ্কর চেঁচামিচি হচ্ছে এক দূর গাঁয়ের একটি চাষ বাড়ীর একদিকে, বেড়ার ওপাশে একটি তেঁতুল গাছে।

'কাঁাচ্ কাঁাচ্ কাঁাচর। কঁ্যাচর কাঁচর। কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্।'

অর্থাৎ একটা শালিখ আর একটা শালিখকে চিৎকার করে বলছে, 'ওটা—বলছি ওটা কিছুই না।'

'তুই বললেই হ'ল ?'

'হ্যাঁ। হোলো।'

কতকগুলো শালিখ একসঙ্গে প্রতিবাদ করল ; কচু জানিস তুই। কিছু জানিস না। শুধু বাজে বকিস্।'

'চুপ কর।' ধমকে উঠল একটা ছেলে শালিখের গলা। সে বলল, 'আমি সব জানি। ওটা মিথ্যে। একটা চালাকী। ফাঁকি বাজী।'

'হ্যাঁ-এ-এ। তাই।' মেয়ে শালিখটার গলায় ঠাট্টার শব্দ উঠল, 'তাহলে কেন অমন দু'হাত বাড়িয়ে একটা জামা গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ ? দেখ্, তাকিয়ে দেখ্।'

কে একটা শালিখ তাকে সমর্থন করল, 'হ্যাঁ। মাথাটা দেখ্! উহ্! বড় বড় চোখ! কি ভয়ঙ্কর ভাবে সব সময় চাদ্দিক আগলাচ্ছে!'

'বল্। দাঁত বের করে এমন রয়েছে যে পেলেই মনে হয় ছিঁড়ে খাবে!'

পুরুষ শালিখটা বুঝি খ্যাক্ খ্যাক্ করে খানিকটা হেসে ওঠে। কিন্তু

কয়েকটা শালিখ মেয়ে ওর কথায় পাত্তা দেয় না।

একজন বলে, 'জানিস ময়না, আমি নিজের চোখে দেখেছি ওর দাঁতগুলো নড়ে।'

'নড়ে।' পুরুষ শালিখটা অবাক হতে গিয়ে বলল, 'দাঁত গুলো নড়ে!'

'না না। চোখ। চোখ ঘোরে।' মেয়েটি আবার বলল।

'তুমি নিজের চোখে এসব দেখেছো ময়না?'

'কি জানি ঠিক বলতে পারব না। তবে ওকে দেখলে আমার মনে হয় ও সব্বোদাই জেগে আছে। আর বেঁচে আছে। ওর জামা দোলে! আঙুল নড়ে। এটা তো সবাই দেখে। দেখতে পায়। কি, দেখনি তোমরা?'

'হ্যাঁ দেখেছি।' মেয়ে শালিখ ক'জন খুব গোলমাল করে ওঠে। কিন্তু গুয়ে ময়না জাতের এই শালিখ পুরুষটা ভীষণ এক গুঁয়ে। এই তরিবাড়ীর মালিক হরিসাধন দাস মহাশয়ের বলদটা যেমন অথবা বাড়ীর মালিক হরি সাধন নিজে যেনন এক রোখা তেজী, জেদী। তেমনি গলায় শালিকটা বললো 'তবু, তবুও আমি বলব ওটা আসল মানুষ নয়।'

'তাহলে কি ওটা?' ময়না শুধলো।

'ভয়। মিথ্যে একটা ভয়ের চেহারা'।

হঠাৎ একটা কাক তেঁতুল গাছের পাতার ঝোপে বসে ডাক ছাড়ল, 'কাক্। কাক্।'

শালিকদল কান পেতে শুনলো কাকের কথা, 'বৃষ্টি আসছে, বৃষ্টি আসছে।' একথা সবাই জানে। তাই নিজের নিজের বাসার কাছে কখন তারা চলে এসেছে।

ময়না শুধলো, 'তাই, কি করে জানলি?'

'আরে ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় ওটা একটা সাজানো ভয়। আমি কতদিন ধরে লক্ষ্য করে করে এটা বুঝেছি।'

'তাহলে তুই ওর কাছে যেতে পারবি ?"

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।'

'কৈ যা দেখি।'

'দাঁড়াও বৃষ্টি পড়া শেষ হোক। তারপর দেখবে কি করবো।'

'কি কি করবি ?'

'ওর মাথার উপর গিয়ে বসব। 'তারপর দেখো সবাই, আমি ঠুকরে দেবো।' ওরে বাপ্ রে!' শালিখদল সবাই ভয়ে চমকে উঠল। কিন্তু সে খুব বীরত্বের গলায় বলল, 'তারপর ওর মাথায় হেগে দেবো।' 'চড়্ চড়াৎ।'

আকাশ ফেটে গেল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এক চমকে ফুটে উঠল একখানা গ্রাম/নাম তার মধুকুপি। কয়েকঘর খড়ের আর টিনের চালের। তার মধ্যে তাল, আম, পাকুড়, বট, খেজুর গাছের নক্সা। আর এই তরিবাড়ী। যেখানে বেশ বলিষ্ঠ শরীর বয়স্ক চাষী হরিসাধন দাস মশাই বেগুন গাছগুলোর চারপাশ ঘিরে যত আগাছা টেনে ছিঁড়ছিলেন। মেজাজটা ভারী। মুখখানা গম্ভীর। এমন সময় বিদ্যুৎ চমকালো।

আর সেই আলোয় সে ও স্পষ্ট ফুটে উঠল।

এক কাক তাড়ুয়া।

চারদিকে লাউ, বেগুন, ঢেঁড়স, সীম, মূলো আর কলাগাছ ভরা সবুজ এক পৃথিবী। যেখানে সে এক পাহারাদার, দিনরাত। সেই যেন কবে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের গোড়ায় কুমড়ো লতায় ফুল ফুটেছে। বাঁদিকে অনেকগুলো বেঁটে পেঁপে গাছে ফলের রাশি। গাছে গাছে ঝুলে আছে কলার কাঁদি!

একটা কাকতাড়ুয়া এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ ঝলক শেষ হলে যেন হঠাৎ দেখলো পূর্বদিকের একটা তালগাছের মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আর খুউব জোর একটা শব্দের কাঁপন তার হাঁড়ির মাথার ভেতর ঢুকে পাক্ খেতে শুরু করল। তারি

মধ্যে সে শুনল হরিসাধন সোজা দাঁড়িয়ে বললেন, 'মামলা ! ঠিক আছে মামলাই হোক। আমি দেখেই নেবো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।'

আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এবার মোটা গোঁফ আলা মুখের তাঁর চোখ দুটো পিট্‌-পিট্‌ করে উঠল। তিনি বললেন, উহঁ, উহঁ, এটা তো ভাল নয়, প্রত্যেকদিন এমন করে যদি বিষ্টি হয় তাহলে তো ভাল নয়। কেলেঙ্কারী ব্যাপার। এতে ফসলে পোকা ধরবে। ওহ্‌, কাকে কি বলা যায়!' আর ঠিক সেই সময়ে এই বিকেল বেলায়, ঝর ঝর করে বৃষ্টি নামলো।

চুপ করে গেল পাখি ডাকা, মানুষের কথা বলা। শুধু শব্দ বাজল ঝর্ঝর...ঝর্ঝর...। পাহারাদার তরিবাড়ীর মাঝখানে বৃষ্টিজলের ঝাপসা পর্দার ভেতর দাঁড়িয়ে একা ভিজতে লাগল আর ভাবতে লাগল।

আসলে, এই কাকতাড়ুয়াটার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। কবে যেন একদিন তার মাথাটার নীচে যে বাঁশের ঘাড় সেখানের ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল একদল জোনাকি। তারপর সেখানের মাকড়সার জালের গিঁঠে গিঁঠে তারা আলোর ছোঁয়া দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে, সেই থেকে এই কাকতাড়ুয়াটা কিছু ভাবতে পারে। তার কিছু স্মৃতি আছে।

অঝোর ধারার একলা রাতে কাকতাড়ুয়া ভিজেজামা গায়ে সিঁটকিয়ে, আঙুলগুলি নেতিয়ে মাথা একটু কাত করে ভাবনা শুরু করল।

মনে আছে, একদিন তার মাটির গায়ে রঙের প্রলেপ মাখানো হয়েছিল। আঁকা হয়েছিল লতা পাতা পদ্মফুল। বড় বড় প্রজাপতি। তার গলা পর্যন্ত ভরা ছিল বিয়ে করতে যাবার মিষ্টি। সে ছিল একদিন.....

কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতর এক ঝিঁ ঝিঁ পোকা হঠাৎ ঢুকে পড়ে বেহালায় ঝালা বাজাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। পাতলা মেঘেরা

উড়ে যাচ্ছে। চারদিক নিশ্চুপ। এখন কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতর হাজার জীবের ঘর বাড়ীর বিচিত্র এক বসবাস। সেখানে হঠাৎ ভি ডিও ক্যাসেটে ছবি ফুটে উঠল। ফুলে ফুলে সাজানো একটা ট্যাক্সিতে টোপর মাথায় বর। পায়ের তলায় সে। শহর থেকে গ্রামে এক বিয়ে যাচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের লাল আলোর ছটায়। তারপর আলো বাজনা উৎসবের জমজমাট পরিবেশে সে কুমোরের একরাশ তৈরী মাটির হাঁড়ির একটা বড় সৌভাগ্যে এসে পড়েছে একটি বাসর ঘরে। ঘুমিয়ে পড়েছে যত মানুষ। জেগে আছে বর আর বউ। আলো নেভান ঘর। কিন্তু বাইরের আকাশে একখানা মস্ত চাঁদ খোলা জানলা দিয়ে উঁকি দিয়েছে। সেই আলোর একটা রেখা কোন্ আশ্চর্য উপায়ে তার উপর পড়েছে। হাঁড়িটার মুখের ঢাকা খোলা হয়নি। ভরা আছে সুখে আর সৌন্দর্যে!

এই রকম একটা ছবির দৃশ্য কাকতাড়ুয়ার মাথায় এসে গেল। সে দেখে যেতে লাগল আর শুনতে লাগল দুই মানব-মানবীর কথা।

বর বলল, 'ওই হাঁড়িটা, তাকিয়ে দেখ প্রভা।'

তাকিয়ে ছিল বিয়ের ক্ষনে। সোনালী রূপালীতে হাঁড়ির গায়ে কারুকাজ! বর বলল, 'ওটা আমার প্রাণের বন্ধু গোপী দত্ত আমাকে উপহার দিয়েছে। বলেছে, বাসর রাতে কেবল তোমার সামনে খুলে প্রথম একটা মিষ্টি তোমাকে খাওয়াতে। তারপর সবাইকে বিলি করতে। তুমি খাও প্রভা। আমি খুলি।'

কাকতাড়ুয়ায় মাথার ভেতর হঠাৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে উঠল একটা মেঠো ইঁদুর ঢুকে পড়ায়। সেটা এমন উৎপাত আরম্ভ করল যে ঝিঁঝিঁর বাজনা বন্ধ হয়ে গেলো। ছবি গেল হারিয়ে। তার মাথাটা টলমল করে অন্যদিকে কাত হয়ে গেল। আর ফট্ করে ইঁদুরটা বেরিয়ে গেল। ছিঁড়ে গেছে কিছু স্নায়ুতন্তু। সেগুলোর আবার মেরামতের কাজ চলল ভেতরে। আর কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে দেখা হ'ল চাঁদের। একই রকম চাঁদ/তবে এটা ভাদ্র মাসের রাতের!

'এই যে শুনছো।' কাকতাড়ুয়া তার দিকে চোখ রেখে বলল ; 'কেমন আছো ? আমাকে চিনতে পারো ?'

এই বৃষ্টিছাড়া নীল আকাশে চাঁদ ঝট্ করে নীচে ঝুলে এল।

মাথায় এখন ঘন আলকাতরার প্রলেপ। গোল চোখ-মুখ আঁকা দাঁত বের করা চেহারার কাকতাড়ুয়া বলল, 'অবশ্য তোমার দোষ নেই। এখন আমার চেহারা, থাকবার জায়গা অনেক পাল্টে গেছে তো। তবু শোনো, তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিই চাঁদ। সেই যে এক বিয়ের রাতে তুমি ছিলে জানলার বাইরে। আর আমি ছিলাম ঘরের মধ্যে নক্সা আঁকা, গলা পর্যন্ত মিষ্টিতে ভরা একটা হাঁড়ি। মনে আছে তোমার ?'

চাঁদ শুধু উজ্জ্বলভাবে হাসলো।

কাকতাড়ুয়া বলল, 'যদি না পড়ে, শুনে যাও তোমাকেই বলি আমার কিছু কথা।'

'তোমার কথা!' চাঁদ আর একটু ঝুলে এল তার চোখ দুটোর সামনে। কাকতাড়ুয়া গভীর গলায় বলল, 'হ্যাঁ চাঁদ, আমার কিছু দুঃখ সুখের কথা আছে যা কাউকেই বলবার নয়।'

'তোমার দুঃখ সুখ।' চাঁদ খুব অবাক হয়ে তার শরীরের কালো ছাপগুলোকে আরো কালো করে তুলল।

'আমি একটা মাটির হাঁড়ি। রঙ মেখে একটা ভূত সেজে দাঁড়িয়ে আছি। আগলাচ্ছি ফসল। এখন আমার নাম—'

'কি নাম তোমার ?'

'সে একটা আছে।' কাকতাড়ুয়া বলল, 'তুমি কি ভেবেছ যে, আমার ভাববার বা বোঝবার কোনো ক্ষমতা নেই ?'

'না না।' চাঁদ আরো কালো করে ফেলল তার ছাপ। বলল, 'আমি মোটেই তা ভাবিনি ! ভাবছি ওই সুখ দুঃখ কথাটা।'

মাথার ভেতর মাকড়সারা জালের শিরা উপশিরা দিয়ে আবার স্নায়ুগুচ্ছ তৈরী করে দিতেই ভাবনা-চিন্তার ব্যাপারগুলো

কাকতাড়ুয়ার মধ্যে এসে গেছে। একটা ঝিঁ ঝিঁ নরম শব্দে বাজনা বাজাতে শুরু করেছে আবার। তার মানে, কাকতাড়ুয়ার একটু আগের অবস্থাটা আর নেই। সে হেসে বলল, 'চাঁদ পৃথিবীর সুখদুঃখ কি জিনিস সে তো তুমি বুঝবে না। কেননা, তোমার মাটিতে আর আমার মাটিতে অনেক ফারাক।'

'কি রকম?' চাঁদ যেন এবার রেগে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তোমার মাটি মরা। শুকনো। একটু কোথাও জল নেই। বিরাট বিরাট সুড়ঙ্গ আর পাহাড়। সেখানে একটা প্রাণ নেই।'

'না। তা নেই।' চাঁদ কথাটা মেনে নিল।

কাক-তাড়ুয়া বলল,'অথচ আমার এখানে কোটী কোটী প্রাণ। তাদের একদলের সঙ্গে আমার জীবন মিশে গেছে চাঁদ! সেই-সব কথা আমার কিছু আছে তার মানে, যাদের সঙ্গে আমার জীবনের খানিকটা জড়ানো, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব! তাদের নাম মানুষ!

'আচ্ছা আচ্ছা।' চাঁদ যেন ভাবনার গলায় বলল, 'ওই একবার কয়েকজন ওরা, মনে পড়ছে, আমার উপর এসে নেমেছিল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' কাকতাড়ুয়া খুব উৎসাহের গলায় বলল, 'ওরা, ওরাই। আমার এই হাঁড়ি চেহারাটা যে মাটি থেকে তৈরী ওরাই সেই মাটির জীব।'

চাঁদ যেন নিজের একটা জায়গার দিকে চোখ রেখে বলল, 'সেই আমার যে দাগ, তা আমার মাটিতে এখনো আছে।'

'থাকবে থাকবে।' কাকতাড়ুয়া যেন আব্দারের গলায় বলল, 'চিরকাল থাকবে।'

'তা থাক্।' চাঁদ কথাটা গ্রাহ্য করল না! বলল, 'বল, কি বলছিলে তোমার সুখ দুখের কথা শুনি।'

কিন্তু কাকতাড়ুয়ার হঠাৎ আজ চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কি একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সে এই পৃথিবীর এক জায়গার খানিকটা মাটি। যদিও চেহারাটা তার অন্যরকম। প্রথমে পোড়ানো তারপর

রঙ মাখানো/তবু তার মনে চলে আসে কত দূর পেছনের একগাদা কথা। যা বলতে গেলে রাত শেষ হয়ে যাবে তবুও ফুরবে না! তাই সে চুপ করে থাকলো। কিন্তু চাঁদের তো সে উপায় নেই। সে মধুকপির পুব আকাশ থেকে উঠে আকাশ গোলকটার একদিকে হেঁটে যাচ্ছে পশ্চিমের মুখে। তার এই চলা ভীষণ এক অদৃশ্য শক্তির নিয়মে বাঁধা। তাই সে সরে গেছে কাকতাড়ুয়ার সীমানা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা। সেখান থেকে চাঁদ কথা বলল, 'শোনো ভাই, পৃথিবীর মাটির হাঁড়ি, আজকে তোমার কথা আর আমার শোনা হবে না। দেখছো তো আমি সময়ের টানে তোমার থেকে কত দূরে দূরে সরে যাচ্ছি। কথা শোনা যাবে না ভাই। কাল আবার যখন প্রথম উঠে আসবো তখন বোলো, এ্যাঁএ, কেমন যাই।'

হারিয়ে গেল চাঁদের গলা। অনেক দূরের আকাশের দিকে সে চলে যেতে লাগল। কাকতাড়ুয়া চারপাশের এই সব্জীর মাঠে দাঁড়িয়ে থাকল। একদিকে কাট-কাঠির মাচায় বরবটি লতারা চেপ্টে বসে গেছে বৃষ্টির ধাক্কায় মাটিতে লতানো পুঁইডাঁটার পাতাগুলো যেন এই জলে আরো পুরুষ্ট হয়ে তেল চকচকে গায়ে চাঁদের আলো ধরে রেখেছে। মাঠ খানার এদিক জুড়ে তাদের খুব বাড়-বাড়ন্ত! আর আছে ফলভরা ঢেঁড়স গাছের দল লাউয়ের লতাগুলো বড় বড় শুকনো ডালে জড়িয়ে ঝোপ বানিয়েছে। কুমড়োর লতানে ডাঁটাগুলো এগিয়ে আসছে তার দিকে। কিছু শশার চারা ঢাকা পড়ে গেছে ওদের পাতার তলায়। কিন্তু সবই তো রাত্তির মায়ায় আবছায়া! তারি মধ্যে কাকতাড়ুয়া ডুবে গেল আপন ভাবনার জগতে। তার মনে এল, প্রথমেই মনে পড়ল, সেই মেয়েটিকে। যার নাম প্রভাতী। বিয়ের সাজে সাজা কনেটি হাঁ করেছিল, আর তার বর এই হাঁড়িটার মুখের বাঁধন খুলে তুলে আনা একটি মিষ্টি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কাকতাড়ুয়া যেন বুঝতে পারছে যখন কোন ঘটনা হতে থাকে তখন সেটা এমন কিছুই থাকে না। কিন্তু সেটা পেছিয়ে গেল,

যাকে বলে অতীত হলে, যেন, একটা বিশেষ কিছু হয়ে যায়। এই যেমন আজ হঠাৎ করে ভাবতে বসে সে পেছনের জীবনটাকে পুরোপুরি দেখে ফেলল। কিন্তু তার দেখাটা হল, কোনো রকম নিয়ম না মেনে। আগে পিছু মাঝ কিছুরই ঠিক রইল না। কারণ সে সাধারণভাবে একটি নির্জীব মাটির কলসী জাতীয় হাঁড়ি। ছিল হরিসাধনের মেয়ের বিয়ের তত্ব। ওই তো, এখান থেকে দেখা যায় তার থাকার জায়গাটা। তরিবাড়ী থেকে বেরিয়ে খানিকটা কাঁচা মাটির পথ শেষে হরিসাধনের গোয়াল তার পাশের বাঁশ ঝাড়গুলি বনের মত। সেটার পর একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। তারপর মাটির দেওয়ালে খড় আর টিনের চালের বাড়ী। এইখানে একটি মেয়ে ছিল প্রভাতী।

হাঁড়িটির ভেতরে অন্ধকার। সেখানে মানব মস্তিষ্কের স্নায়ুজালের মত অজস্র রূপোলী সূতোর জাল বোনা হয়েছে। একটি অচল মানুষের ভাবনার কেন্দ্রে যে সমস্ত বৃত্তগুলো বসে থাকে তেমনি কাক-তাড়ুয়ার মাথার ভেতরে মেঠো পোকাদের সাদা পর্দার গোল গোল ঘর-গুলোতে ডিমেরা বাচ্চায় পরিণত হয়ে উঠছে। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পন্দন ডিমের আবরণকে কাঁপাচ্ছে। আর জ্বলছে একটা জোনাকী বাজছে ঝিঁঝিঁট রাগিনী কোন্ বেহালায়। তখন কাকতাড়ুয়া একটা যেন মানুষ হয়ে গেছে।

তার মনে পড়ছে ওই একটা ঘরে দুটো দৃশ্য! না আর একটা আছে। সেটাই তার জীবনের প্রথম অনুভবের জন্মের কারণ। কিন্তু সেটা এখন নয়। প্রথমে বিয়ের রাতের প্রভাতী!

বউকে মিষ্টি খাওয়ানো শেষ হলে বর বলেছিল, 'প্রভাতী প্রভাতী প্রভা,আমার বন্ধু গোপী দত্ত যখন শুনবে সে যা চেয়েছিল তাই হয়েছে তখন সে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে প্রভা। কিন্তু, সে বেচারা তা পারবে না?'

'কেন? পারবে না কেন?'

'সে পঙ্গু প্রভা। জন্ম থেকেই তার পা দু'টো অচল। তাই বসে

বসে সে ছবি আঁকে।'

'গোপী দত্ত, শিল্পী। বড় বড় চোখে কাজলটানা দৃষ্টি ফুটলো প্রভাতীর। 'ঠিক তা নয়। তবে আঁকে। সে আমাকে বলেছিল রাজীব তোর বিয়েতে আমার যাবার খুব ইচ্ছে রে।'

'একেবারে চলতে পারে না বুঝি?'

'না। পেছন ঘষটে ঘসটে একটু আধটু যায়, ওই ঘরের ভেতরেই। তা সে বলল, রাজীব তোর বিয়েতে যে মিষ্টির হাঁড়িটা যাবে সেটা আমি মনের মত রঙ করে দেবো।'

প্রভাতী ভালো করে তাকিয়েছিল হাঁড়িটির দিকে। চাঁদের ছটার একগুচ্ছ আলোর বিন্দু তার গায়ের সবুজ লতা পাতা ও রঙ্গিন প্রজাপতির নক্সায় পড়েছিল।

এই একটা দৃশ্য। আর একটা দৃশ্য, কাকতাড়ুয়া হিসেব করলে ঠিক বলে দিতে পারে ক'টা দিন ক'টা রাতের পর প্রভাতী একা ফিরে এলো তার বাপের বাড়ীতে। কিন্তু প্রভাতী কৈ?

এই আর একটা দৃশ্য। যখন আলো মরে যায়, পৃথিবীর গাছপাতা ফুল কিছুই চোখে পড়ছে না, তেমনি ছিল যেন ফিরে আসা প্রভাতীর চেহারা! হায়রে, কি ক্লান্ত চোখ। অন্ধকার মুখ। যেন খুব একটা অসুখ করেছে তার। কথা বলে না। এই ঘরটা. মাটির দেয়াল টিনের চালের একটায় তার বাসর হয়েছিল। তার ভেতরে প্রভাতীর বিয়ের আগের জিনিসপত্র—তক্তা বিছানা, মধু কুপির-মেয়ে স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্রীর বইগুলো, আয়না-চিরুণির একটা কাঠের তাক্। তার পাশে বড় একটা দেওয়াল কুলুঙ্গিতে সে ছিল মাটির বিচিত্র একটা হাঁড়ি-চেহারা। মিষ্টিগুলি নেই, ছিল গোপী দত্তের ভালোবাসার রঙে রাঙানো শরীর।

বিয়ের কয়েক মাস পর প্রভাতী মধুকুপিতে ফিরে কি রকম প্রাণহীন একটা মেয়ে হয়ে গেল। চলে ফেরে, খায় দায় কিন্তু কি তার হয় এই ঘরে এসে চুপচাপ জানালার শিক ধরে অনেক সময় বাইরের

দিকে তাকিয়ে থাকে। সে চুল আঁচড়ায় না। ভাল কাপড় পরে না। আয়না তুলে নিজের মুখটাকে পাউডারে, টিপে সাজায় না। কখনো কখনো এসে কুলুঙ্গিতে রাখা সুন্দর দেখতে হাঁড়িটার দিকে কী রকম যে চোখে তাকিয়ে থাকে। পলক পড়ে না। শুধু চাপা গলায় কখনো কখনো সে বলে. প্রভাতী বলে, 'কোন দরকার নেই। তোর আর কোন দরকার নেই আমার জীবনে। তোকে ছাইগাদায় ফেলে দিয়ে এলে ভাল হয়। কিন্তু—কিন্তু—'

কি হয়েছে মেয়েটির? কি হয়েছিল? কাকতাড়ুয়া স্পষ্ট করে কিছু জানে না। তবে সে ভেবে নিতে পারে পৃথিবীর মাটিতে জন্ম নেওয়া কতগুলো জীব মানুষ, তাদের মেয়েদের জীবনে কত দুঃখের ঘটনা আজো একই জায়গায় আছে। কাকতাড়ুয়ার এখন মনে পড়ে সেই রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা দেবীর কথা। তিনিও তো বড় দুঃখে, বড় অপমানে বলেছিলেন, ধরণী দ্বিধা হও। আর মাটি ফেটে গিয়েছিল। মাটির থেকে জন্ম সীতাকে মাটিই আবার মিশিয়ে নিয়েছিল। সেই সীতা যেন আজ প্রভাতী হয়ে তার কাছে এসেছে। বড় আদরে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলছে 'তোর গায়ে পদ্মপাতা, ফুল মৃণাল। প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।' বলতে বলতে প্রভাতী হাত তুলে নিজের দু'চোখ চেপে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এই দৃশ্য দু'টোর পরেরটা। সেটা ঘটেছিল একদিন মাঝরাতে।

কাকতাড়ুয়ার সমস্ত মাথার মধ্যে একটা ব্যথা, কষ্টের যন্ত্রনা ছড়িয়ে পড়লো। একটা গঙ্গাফড়িং তার মাথার একপাশে ডিম রেখেছিল খুব যত্ন করে আড়াল দিয়ে। কিন্তু ডিমগুলি তার ইঁদুরের লাফ ঝাঁপে ভেঙে গেছে। তাই সে বড় দুঃখে বেহালায় বেহাগের ছড় টেনে কাঁদছে। গুমরে উঠছে কাকতাড়ুয়ার চেতনা। সে একেবারে চুপ করে থাকল। নির্বিকার মাটির হাঁড়ি।

সকালের আলো ফুটতে কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল এক হনুমানের। বেড়ার বাইরে একটা নিমগাছের ডালে বসে সে থির

চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর মাঝে মাঝে কোমরের কাছটা ঘষ-ঘষিয়ে চুলকে নিচ্ছে।

'বোকাটা!'

কাকতাড়ুয়া এই বলে তাকে সুপ্রভাত জানালো। তারপর হাল্কা মেজাজের গলায় বলল, 'চলে এসো না হে উপ্‌ করে, একটা ঝাঁপ মেরে। আরে ভাই, আর কিছু পাও চাই না পাও কুমড়োর ছানা-পোনা, ঢেঁড়সের বড় বড় সব সাইজ—'কিন্তু কাকতাড়ুয়া হঠাৎ তার গলাটাকে মোটা আর গমগমে করে বলল, 'তবে মনে রেখো আমি আছি। একখুনি ঝাপ্টে ধরে কপ্‌ করে গিলে খাবো।'

হি হি করে তারপর হাসিতে হাত ঝাঁকড়ে হেসে উঠল কাকতাড়ুয়া। আসলে তার যে হাত সেটা তাড়াতাড়ি একটা লাঠিতে খড় পাকিয়ে তৈরী। আর সেখানের যে আঙ্গুলগুলো কালো প্লাস্টিকের সিট্‌ থেকে কেটে নেওয়া পাঁচটা করে দশটা লম্বা ফালি।

কাকতাড়ুয়ার খড়ো হাতের উপর একটা গিরগিটি রঙ পাল্টে বসেছিল। সে হঠাৎ চারপায়ে ছুটে চলে এলো কাকতাড়ুয়ার ডান হাতের আঙ্গুলগুলোর কাছে আর সেই ঝোলা লম্বা আঙ্গুলগুলো নড়ে উঠল খলবল করে। সেই সঙ্গে আর একটা গিরগিটি ঝাঁপিয়ে উঠল তার মাথার উপরে।

কাকতাড়ুয়ার এমনি নড়ে ওঠা দেখে নিমগাছের বীর বাঁদরটা ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, উঁপ্‌ উঁপ্‌!'
তারপর সে ঝপাৎ করে গাছটার আরো উঁচু ডালে উঠে বসল গুটিসুটি হয়ে! সেখান থেকে সে লক্ষ্য রাখলো, ওই যে ভয় দাঁড়িয়ে আছে ভীষণ চেহারায়, তার গায়ের ঝলঝলে জামাটা নড়ছে ঝাপ্‌টা দিয়ে। হনুমান দেখতে পাচ্ছে না ওখানে দু'টো গিরগিটিতে এখন ভয়ঙ্কর রেষারেষির ছুট্‌ চলছে! কাঠের টুকরোর উপর বসানো মাথাটা এখন একপাশে কাত হয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি বাঁদরের দিকে!

এমন সময়ে একটা শালিখ ঝপাৎ করে উড়ে বসল তার মাথার

উপরে। মাথাটা এমনি ভাবেই বসানো যে একটু কিছু হলেই সেটা নড়বড় করে। এইটাই হ'ল কাকতাড়ুয়ার এখনকার হেসে ওঠার বাইরের প্রকাশ।

কিন্তু এগুলোই হ'ল সেই বাঁদর আর শালিখের প্রবল ভয়ের কারণ। প্রায় একই সঙ্গে শালিখটা ঝাঁপ খেয়ে শূন্যে উড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাবা! একি রে! ধরা পড়লাম নাকি রে!'

আর বাঁদরটা গাছের মগ্ ডাল থেকে 'উঁ-প' শব্দে মাটিতে লাফ মেরে লেজ পিঠের উপর তুলে দে দৌড়!

গিরগিটি দু'টো তখনো ছুটোছুটি করে চলেছে ওর জামায়, হাতে, মাথায়। হাঁড়ির গলাটা উল্টো মুখে দু'কাঠের মাঝখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাই সেটা খসে পড়ছে না। নড়বড় করছে এদিক থেকে ওদিক চোখ দু'টোর দৃষ্টিতে কখনো আসছে মাটি কখনো আকাশ।

একটা বীর বাঁদর, শক্তিশালী শরীর কী দারুণ ভয়ে পালাচ্ছে মাঠ ভেঙে দূরে। আর মাথার উপরে সাঁ করে উড়ে গেছে শালিখটা। সেখানে ভেসে আছে আরো কয়েকটা শালিখ।

তারা চিৎকার করে বলছে, 'পালিয়ে আয় পালিয়ে আয়। ধরে খেয়ে ফেলবে। মরে যাবি!'

অপরাজিতার পাপড়ির মত আকাশটা নীল। তার সঙ্গে মিশে আছে কুমড়ো-ফুলের রঙের রোদ। পালিয়ে গেছে বীর হনুমান। উড়ে গেছে সেই দুঃসাহসিক গুয়ে-শালিখটাকে নিয়ে গতকালের তার্কিক দল। এখন তরিবাড়ীর চারিদিকে উড়ছে ফড়িং প্রজাপতির রঙ্গিন সৌন্দর্য। মৌমাছিরা গান গেয়ে মধুবুক ফুলগুলিতে বসছে। গিরগিটির লড়াই অনেকক্ষণ থেমে গেছে। শুধু হাল্কা বাতাসে তার আঙ্গুলগুলি আর ঢোলা জামার কাপড় অল্পস্বল্প দুলছে।

এই সময় কোথা থেকে একদল চড়ুই কিচির-মিচির করে এসে পড়ল তার কাছে। নেমে পড়ল পায়ের গোড়ার মাটিতে। সেখানে রোদ পেয়ে কালকের নরম মাটির তলা থেকে এসেছে কেঁচো, আর

পোকার দল। চড়ুইগুলো মেতে উঠল সেই সব খাবারের স্বাদে।

কাকতাড়ুয়ার মনে হ'ল, জীবের শরীর রাখতে হলে খাবার চাই। কিন্তু সে জীব নয়, মাটি। তার এই শরীরটার জন্যে কোনো খাবার লাগে না! তবু চেতনা থাকে তার মধ্যে! এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার বলে তার নিজের কাছে নিজেই মনে হল।

কিন্তু সে দেখলো হরিসাধন আর তার ছেলে এসে ঢুকল এই সবুজ দেশের বাঁশের গেট খুলে, দুটো ঝুড়ি হাতে।

কাকতাড়ুয়া কি করে যেন বুঝে গেল ভিন্‌ডিগুলোর আগুিল ফসল হয়েছে। আজ ওরা দু'জনে নির্ঝাড় করে সব তুলে নেবে। সে এই ফসল খেতের পাহারাদার এতোদিন ওদের রক্ষা করেছে। আজ আর পারবে না ভেবে মন বিষন্নতায় ভরে গেল! কাকতাড়ুয়া চুপ করে শুনলো বাপ-বেটায় কথাবার্ত্তা। হরিসাধন বলছেন, 'বুঝলি নদা, কাকে কি বলা যায়!'

নন্দন বাবার পাশে পাশে হাঁটছে। এক পলকে সে কাকতাড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর চলল মাটির দিকে চেয়ে। ফসলের গা বাঁচিয়ে যেতে যেতে সে বলল, 'কিসের বাবা?'

আরে কিসের। এই একটা শালোপাম্, বুঝলি নদা, যদি পেতাম।' 'স্যালোপাম্প!' নন্দন ক্লাস এইটে পড়ে। সে বাবার উচ্চারণ ঠিক করে দিল।

কিন্তু হরিসাধন আবার বললেন, 'হাঁ। শালো-পাম্ যদি পেতাম তাহ'লে আমি মাটিকে সবুজ করে দিতে পারতাম নদা। আমার শশুর গাঁয়ে, তোর মামার বাড়ীতে, তো দেখে এসেছি। কিন্তু কাকে কি বলা যায়?' নন্দন জানে তার বাবার হাতে অত পয়সা নেই। কিন্তু ইচ্ছে আছে খুব। তাই সে বলল, 'হয়ে যাবে একদিন।'

'হয়ে যাবে একদিন!'

একজন ছেলে চাষী হরিসাধন খুব রেগে উঠে ওই কথাটাকে খুউব ব্যঙ্গ করে উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, 'তুই আর কি বুঝবি

নদা, ওরা কিছুতেই আমার মাঠে ওই পাম্প বসতে দেবে না।'
,কেন ?' বাবার দিকে মুখ তুললো নন্দন।

কাকতাড়ুয়ার খুব কাছে এখন এরা। দেখা যাচ্ছে, বয়স্ক এক মুখে চোখে কপালে অনেক পরিশ্রমের চিহ্ন, চুলগুলি জীবনের অভিজ্ঞতায় ধূসর। তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে খালি গায়ে নীল প্যাণ্ট পরা কিশোর এক। মুখ খানি কচি লাউয়ের রঙের। বড় বড় দুটো চোখ। তার তরুণ চুল একরাশ হয়ে এলোমেলো।

হরিসাধনবাবু বললেন, 'কেন আবার কি ? আমি কোনো পার্টি করি না।' 'কেন ?' নন্দন আবার সেই প্রশ্নটা করলো।

হরিসাধনবাবু চলতে চলতে বললেন, 'কেন কি না, আমি কাজ করতে চাই। ভাল ফসল ফলাতে চাই। দেশের ফলন বাড়াতে চাই। এটাই আমার পার্টি করা এই আমি বুঝি নদা। তো, কাকে কি বলা যায়। শোন্, শক্ত ডগার সব ঢেঁড়সগুলো তুলে নিবি।' তিনি তাকালেন ভিণ্ডি বা রামঝিঙে বা ঢ্যাঁড়স নামের ফসল বাগানের দিকে। তাঁর দু'চোখ কুঁচকে গেল। বললেন, 'তা কেজি দশেক হবে মনে হয়। দশ দুই, কুড়ি টাকা। নদা, তুই এগুলো বাজারে নিয়ে বসবি, আর আমি দেখি কতগুলো বেগুন হয়।' কথাগুলো বলতে বলতে ওরা কাকতাড়ুয়ার পাশ দিয়ে পেরিয়ে চলে গেল। কিন্তু কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতর একটা শব্দ বোঁ-ও করে বাজতে থাকে। বাজার... বাজার! এখান থেকে অনেক দূর এক শহর। তার একদিকে কুমোর বাড়ী। সেইখানে তার মাটির শরীরের এইরকম একটা চেহারা হয়েছিল। গভীর কিছু অতীত কথা তার মনে আসে। কিন্তু কি সেটা, কোন্ কথা, কোন্ ভাবনা ঠিকমত বুঝতে পারে না কাকতাড়ুয়া। শুধু সে মনে করতে পারে তারপর সেই ঘর থেকে সে একদিন ··

কিন্তু না, কাজ শেষে নন্দন কখন এসে তাকে ছোঁবে এই অপেক্ষায় সে জড় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। রোদ বেড়ে যেতে লাগল। পাখিরা গাছের পাতার আড়ে গিয়ে ডাকাডাকি করতে

লাগল। হয়তো অপেক্ষায় অপেক্ষায় তার ঘুম পেয়ে গেল। যেন স্বপ্নের মত তার মনে পড়ল, নন্দন তাকে একদিন অবহেলার থেকে তুলে এনে এই মাঠের রাজা করে দিয়েছে। সেই কথা আর দৃশ্য গুলো। যেন ঘুমে, যেন স্বপ্নে। কাকতাড়ুয়া মনে মনে বলল, 'এগুলো আমি চাঁদকে শোনাবো। নন্দন এলে অন্য কথা হবে।'

আর দৃশ্যে তার পোষাক কাঁপলো, আঙুল নড়ল, মাথা এদিক ওদিক কাত হ'ল।

অনেক বেলার রোদে ঘামে টস্‌টসে মুখ নিয়ে নন্দন এসে ছুঁলো কাকতাড়ুয়ার গা।

মুহূর্তে কাকতাড়ুয়ার জড়তা ভেঙে গেল। তার মাথায় কণাকণায় ভাললাগার স্রোত বয়ে যেতে লাগল।

নন্দন কথা বলল, 'কি? কাল আবার বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে তো?'

কাকতাড়ুয়া নিশ্চুপ গলায় বলল, 'এরই নাম কপালের লিখন।'

নন্দন রোদে ঘামে আর পরিশ্রমে ক্লান্ত। খুব বড় একটা ঝুড়ি ভরা রকেটের মত দেখতে ভিণ্ডিগুলো গাদা হয়ে আছে। নন্দনের তুলতে কষ্ট হয়েছে। এইসব কারণে তার গলায় মেজাজী শব্দ বেরুলো। বলল, 'মাঝে মাঝে তুমি এমন করে কথা বল যে গা-সুদ্ধ জ্বলে যায়। আরে আমার কি দোষ—' 'না না।' কাকতাড়ুয়া ব্যাকুল গলায় বলল, 'আমি তোমাকে কিছু দোষ দিচ্ছি না নন্দন। আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে এই রকম করে গড়ে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছ। আমি বলছি, রোদে পুড়ি, বিষ্টিতে ভিজি। এই আমার কপাল। তা বেশ ভালই লাগে। তুমি জেনো আমার কথা, ভুল বুঝে রাগ করো না নন্দন।'

নন্দন তাকিয়ে ছিল কাকতাড়ুয়ার পোষাকের দিকে। সে হঠাৎ বলল, 'এ্যাহ্‌, এ্যাহ্‌! জামার কলারটাতে দেখছি উই লেগেছে।' নন্দন হাতের কাস্তেটা দিয়ে উইয়ের মাটি সরাতে সরাতে বলল, 'যাহ্‌

কাকতাড়ুয়া, তোমার জামাটার ঘাড় একেবারে ফুটো হয়ে গেছে।'

'তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা।' কাকতাড়ুয়া রসিকতার ছলে বলল, 'আমি এখন মাঠ পাহারাদার। তো পোষাকটা পাল্টে দাও। আমাকে একটা নতুন জামা পরাও। বেশ লাল রঙের একখানা ঢোলা হাতা জামা। তাতে আঁকা থাকবে তোমার ওই কাস্তে আর হাতুড়ির ছাপ। আমি, তুমি শুনছো নন্দন? 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল কাকতাড়ুয়া।'

'আমি...আমি সভ্যতার রক্ষক হতে চাই। মহান প্রহরী। এটা আমার ইচ্ছে। স্বপ্ন বলতে পার নন্দন। কিন্তু আমার নামটা এ রকম কেন গো নন্দন? আমাকে বুঝিয়ে বলবে?'

নন্দন অবাক হ'ল। বলল, 'তুমি আবার এতসব ভাবতে শিখলে কবে থেকে?'

'শিখছি। যত দেখছি ততই ভাবতে শিখছি! আর ভেবে দেখছি, তোমাদের এই ফসল মাঠে কাকের উপদ্রব কোথাও নেই। কাক আমি তাড়াই না। তবু কেন আমার এমন নাম, কাকতাড়ুয়া?'

খুব জটিল প্রশ্ন। নন্দন চট করে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। তাই সে বলল, 'এই শোনো শোনো, এখন তোমার সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। দেখেছো তো, বাবা বেগুনের ঝুড়ি নিয়ে কখন ঘরে চলে গেছেন। এরপর খেয়ে দেয়ে আমাদের দুজনকে শহরের বিকেলের হাটে যেতে হবে।' নন্দন একটু থামলো। বলল এবার ভারি গলায়, 'পড়াশোনার সময় একেবারে পাই না। এই দেখ না আজ স্কুল কামাই করে কি করতে হচ্ছে! হাটে যাব। বসব বুড়োদের মত দাঁড়িপাল্লা হাতে ধরে। এসব বল কার ভাল লাগে। কিন্তু উপায় নেই। বাবার হুকুম। এই এক ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি। দু'ঝুড়ি আরো ওখানে থাকল। এসে এসে নিয়ে যেতে হবে।'

নন্দন নীচু হয়ে ভারি ঝুড়িটা মাথায় বাঁধা গামছার পাগড়ির উপর খুব কষ্ট করে তুলল। তারপর চলে যাবার আগে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসল। কাকতাড়ুয়ার আঁকা চোখ মুখ থির। শুধু তার একদিকে এক

চাকলা ফুটো আছে। সেই পথে তার মাথার ভেতর শব্দ ঢোকে। সেই পথে তার ভাবনা-চিন্তার শব্দ বেরোয়। সে বলল, 'আমি যদি হাঁটতে পারতাম, তাহলে তোমার ওই ঝুড়ি, নন্দন, আমি মাথায় বয়ে নিয়ে যেতাম।'

'খুব ভাল লাগল। কথাটা শুনে খুউব ভাল লাগলো। ঠিক আছে দেখি, হাটের পয়সা থেকে খানিকটা লাল সালু যেমন করে হোক শহর থেকে কিনব। তারপর তোমার মনের মত জামা আমি বানিয়ে দেবো। এখন যাই। কেমন?'

'এসো।'

দু'জনে মাথায় মাথায় এক। নন্দন আর একবার তার কাঁধে হাত ছুঁইয়ে চলে গেল প্রথম ঝুড়ি খানা ঘরে রাখতে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কাকতাড়ুয়া তার জায়গায়। কিন্তু চোখ দুটো খোলা থাকল জাগ্রত মূর্তির মত। চেহারাটা ভয় দেখানো বটে। ওই ফুল আর প্রজাপতি-নক্সা হাঁড়িতে নন্দন কেবল মাত্র আল্‌কাতরা বুলিয়ে মাথার কালো চুল, চোখের নাকের ও বড় বড় দাঁতের আকৃতি ফুটিয়ে তুলেছে। ফলে তার সাদা সবুজের সঙ্গে লাল হলুদ প্রজাপতির নক্সার রঙগুলি দাঁতে চোখে গালে ফুটে উঠে এক বিচিত্র চেহারার মুখ তৈরী হয়েছে!

তাকে দেখছে এই ফসল মাঠের বাখারি বেড়া ফাঁক করে সিং ঢোকানো পোড়া মাটির রঙের একটা ছাগল। সে এদিকটায় বড় লোভে সিং ঠেলে বেড়া ফাঁক করে মাথা ঢুকিয়েছিল। কিন্তু তার চোখে পড়ে গেছে কাকতাড়ুয়ার চেহারা।

হাঁড়িকাঠে গলা দেবার মত চুপ করে ছাগলটা থেমে আছে।

কাকতাড়ুয়ার চোখ ছাগলটার সামনে অজস্র ঝিঙে ফুলের বাহার। সবুজ লতা পাতায় সোনালী এই ফুলগুলি...

কোন এক শহরে একটি বাচ্চা মেয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি

করছে। কাকতাড়ুয়ার মনে সে কতদূর অতীতের স্মৃতি ধরে ভেসে এলো কবিতার লাইন ক'টা—

"ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজপাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল—
ঝিঙে ফুল!"

কিন্তু কোথায় শোনা যেন, কবে যেন? ঠিক্ ঠিক্ মনে আসে না! শুধু দেখা যায় ছাগলটার অনড় মাথাটা। হাঁ করা মুখ। সেখানে চকচকে ধারালো দাঁত। ওর জিভের রঙটা কালো।

কিন্তু ঝটাং করে সেই মাথাটা বেড়ার ফাঁক থেকে বেরিয়ে গেল। কাকতাড়ুয়ার চোখ পড়ছে,এক ঘোড়-দৌড় ছুট্। ভীষণ ভয়ের চিৎকার তুলে ছাগল ছুটে পালাচ্ছে, 'ব্যা ব্যা ব্যা-এ-এ ..'

কাকতাড়ুয়ার কানের ফুটো জায়গাটা দিয়ে যেন একটা সাঁ সাঁ বাতাসের দীর্ঘ শব্দ বইলো।

ছাগল-গরু-বাঁদর এমন কি শালিখেরা পর্যন্ত তার ভয়ে মরে। কিন্তু কাকেরা? সে শুনতে পেল এই দুপুর রোদে নিমগাছের ডালে কাকেদের এক পাঠশালা বসেছে। সেখানে কতগুলি কাকের ছানা তার মা বাবার কাছে জীবনের পাঠ শিখছে।

বাবা কাক কঁক্ কঁক্ করে বলছেন, 'শুনছো শিশুরা, ওই যে ফসল মাঠের মাঝখানে হাঁড়ি মাথা একটা আজব জীব দাঁড়িয়ে রয়েছে—'

'কি কি কি?' বাসার থেকে ছেলে মেয়েরা গলা বের করে ডানা নেড়ে বলল।

বাবা বললেন, 'ওটা একটা টঙ্।'

মা বুঝিয়ে দিলেন, 'বসবার জায়গা!'

'কা কা কা কা।' বাচ্চারা একসঙ্গে চিৎকার করে বলল, 'বাহ্ বাহ্ বাহ্ বাহ্।

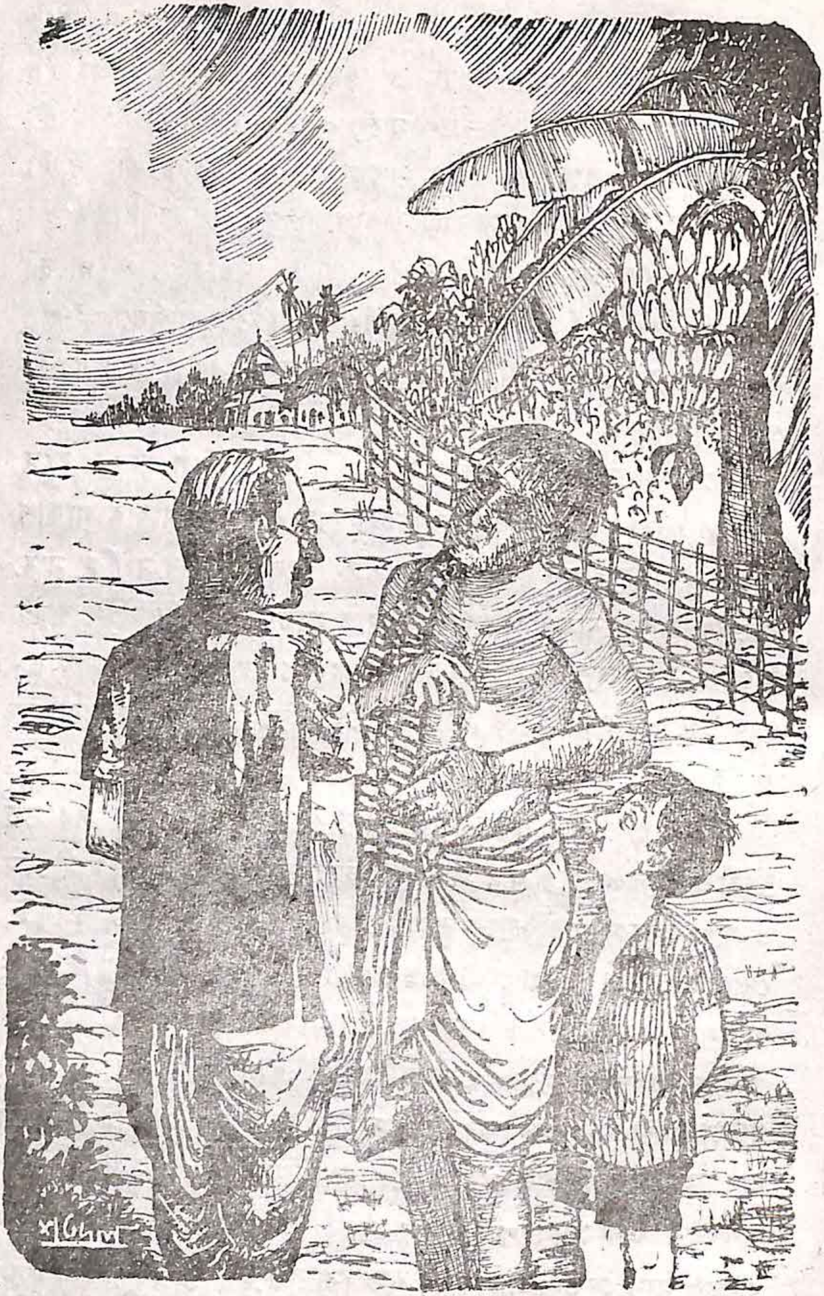
কাকতাড়ুয়া এই প্রথম কাকেদের সংসারের দিকে মন দিল। বেশ ভাল লাগল তার। একটা দিন কত কাকই তো তার

উপরে এ'সে বসেছে। তারপর তার কালো মাথায় পায়খানা করে দিয়ে চলে গেছে। সেই পায়খানার তরল আঠায় লেগে থাকা কত রকম গাছের বীজ তার কপালে ঘাড়ে কতদিন লেগে থাকে। এই তো এতদিন লেগেছিল তার নাকের উপর একটা নিম বিচি। কালকের বিষ্টিতে সেটা ঝরে মাটিতে চাপা পড়ে গেছে। গাছ হবে। তার মনে হ'ল কাকেরা বড় উচ্চস্তরের প্রাণী। তারা অসল গাছের বীজ দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর মাটিকে বাতাসকে সুস্থ করে রাখার মহান দায়িত্ব বয়! ওরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ প্রতিবাদ করে।

মনে আছে, একদিন একটা কাকের বাচ্চা ধরেছিল নন্দনের সঙ্গে বেড়াতে আসা তার এক বন্ধু। কাকেরা দলে দলে তার মাথার আকাশ কালো করে দিয়েছিল। শেষকালে সেই ছেলেটা, শেখর না কি নাম, কাকের ঠোকরানোর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল তারই নিচে। কাকতাড়ুয়া সে ঠোক্কর কয়েকটা খেয়েছিল নিজের মাথায়। শেষ তক্ ওরা বাচ্চা ছেড়ে দিয়ে তবে বেঁচেছিল। কাকরা খুব সামাজিক ও চতুর প্রাণী!

ঝিম্ ধরা বেলায় কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতর এই রকম সব তত্ত্ব তৈরী হতে লাগলো। যার আরম্ভটা ছিল, তার কাকতাড়ুয়া নাম কেন হ'ল? কাকেরা তো তাকে ভয় পায় না! ভয় পায় ফিঙে, বুলবুলি, দোয়েল শ্যামা। এরা কেউ গাছগাছালীর শত্রু নয় বরং বন্ধু। সেই গাছপালার রক্ষক সে। তবু তার এই নাম....এমন নাম...

কাকতাড়ুয়ার মনের ভেতর বিষয়টা এমন বাজে রকমের একটা ঘুরপাক খাওয়া শুরু করল যে সে ঠিক করল, না, আর কিছু ভাববে না। কেবল সে যা তাই হয়ে থাকবে। দাঁড়িয়ে থাকবে এই বড় মাঠটার মাঝখানে এক ফসল পাহারাদার হয়ে। এখানে তার পাহারায় ফলতে থাকবে আলু-বেগুন, লালশাক্, পুঁইলতা, ঝিঙে, ভিণ্ডি। দেদার ফসল সে পাইয়ে দেবে মানুষদের। এই তার কাজ। চুপ করে নিজের



মধ্যে ভাবনার জট পাকানো তার উচিত না, সত্যি কথা বলতে গেলে মানায় ও না। সে তো এক শহরে এক কুমোর বাড়ীর অনেকগুলো হাঁড়ির একটা। তাই সে সবুজ সবুজ তার এলাকাটির দিকে পূর্ণ মন দিয়ে তাকিয়ে দেখল, নন্দন আবার আসছে। কিন্তু একা নয়। সঙ্গে তার বাবা হরিসাধন আর একজন কে।

তাকে কি বোঝাতে বোঝাতে আসছেন হরিসাধন বাবু, 'কাকে কি বলা যায়! এই আমি যখন নিজেই শহরে যাবো বলে ঠিক করেছি, এই দেখ জামা গায়ে দিয়েছি, তখন তুমি এলে।'

'হেঁ হেঁ হেঁ।'

'তুমি তো হেঁ হেঁ হেঁ করে দিলে। আর এদিকে, কাকে কি বলা যার, বেগুনে পোকা লাগছে, বিচি পেকে উঠছে। ভিণ্ডিগুলোর হাড় শক্ত হয়ে উঠছে!'

'না না। শুনেন শুনেন।'

থুতুনিতে হাল্কা দাড়ির ধূসোচুলো মানুষটি কালো দাঁত বের করে বলল, 'আমার সাদি ছিল।'

'সাদি?'

হরিসাধনের তড়পানি হঠাৎ এই একটা কথায় চুপ করে গেল। তিনি আপন মনে বলেন, 'হুঁ বিয়ে। কাকে কি বলা যার।'

'সে তো ঠিক। সে তো ঠিক।'

'কিন্তু বদরুমিঞা তোমার পাঁচদিন দেরী হয়ে গেল।'

গায়ে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবী, ময়লা লুঙ্গি, শীর্ণ চেহারার একটু বয়স্ক মানুষ বদরু মিঞা। এই তিনবার সাদি করল; ভাবলেন না হরিসাধন। বিয়ে শব্দটা তাঁকে মনে পড়িয়ে দেয় মেয়ে প্রভাতীর জীবন কথা। আর মনে পড়লেই তিনি বড় কষ্ট পান। তখন জোরে জোরে কোদাল কোপান বা টেনে টেনে আগাছা ছেঁড়েন।

কাকতাড়ুয়া তাঁর এই রকম কিছু মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে আছে। তার মাথার ভেতরে ছাপা হয়ে গেছে অদৃশ্য অলৌকিকতায় হরিসাধনের

কথা, 'হরি হে, ভাবলে, মন খারাপ করলে মরা মানুষ ফেরে না হে। কখনোই ফেরে না।'

এখন হরিসাধন আর ওই বদরুমিঞা তাকে লক্ষ্য না করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বদরু বলছে, 'তো বলুন কেন, আপনার বাগানে কি কি মাল আছে। আমি সব দেখে বুঝে একমস্তে সব টাকা দিয়ে দিচ্ছি।'

'কিন্তু তুমি তো পাইকারী রেট্ দেবে বদরু।'

'তা তো হবেই আজ্ঞে। শহরটি তো আর এখানে নয়। আপনার পাঁচ কোশ পথ হেঁটে যাওয়া, তারপর বাস। তো ধরুন তার খরচা আছে।'

'হ্যাঁ। খরচা তো আছেই।'

'তারপর ধরুন আমার মেহনতি!' বদরু বিনীত গলায় বলল, 'দু'টো পয়সার জন্যেই তো বাবু আমি আপনাদের দরজায় ঘুরি! তবে যদি কলা, কাঁচকলা ফলান তাহলে আমি আপনাকে ভাল পয়সা পাইয়ে দেবো।'

কাকতাড়ুয়া তাকিয়ে দেখলো তরিবাড়ীর পশ্চিমে কলাবনের দিকে। হরিসাধন বললেন, 'ঠিক আছে। ওই তো কলা লাগিয়েছি। কয়েকটা কাঁদি এসেছে। এখন তুমি যত বেগুন আর ঢেঁড়স আছে চুক্তি করে নিয়ে যাও।'

'শুধু বেগুন ঢেঁড়স! বাজারে এসবের আমদানী এখন দেদার বাবু। এর আর কি দাম পাবেন? চলুন, দেখা যাক্।'

কয়েকটা পেঁপে গাছ পেরিয়ে ওরা চলে গেল। নন্দন অনেক আগেই সেখানে গেছে। দু'ঝুড়ি ভিত্তি রয়েছে মাঠে।

কাকতাড়ুয়া ঘটনাটা বুঝল। বদরুমিঞা সেইসব ফড়েদের একজন যারা গাঁয়ে গাঁয়ে চাষীদের থেকে সস্তায় ফসল কিনে শহরে আগুন দামে বেচে। এইখান থেকে কতজন এমন নিয়ে গেছে আর টাকা হাতে নিয়ে বাপ-বেটার আপশোস সে শুনেছে! মনে আছে সব।

কিন্তু কাকতাড়ুয়া এখন আর একটুও ভাবা-ভাবিতে যাবে না ঠিক করেছে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে একটা লাঠির উপর ঢোলা জামা, খড়ের হাত, প্লাস্টিকের আঙুল আর হাঁড়ির মাথা নিয়ে!

'বাবাবাহ্।'

কাকতাড়ুয়ার কাঁধে হাত রেখে ফিরতি পথে থমকে দাঁড়ালো বদরুমিঞা।

চমকে উঠল কাকতাড়ুয়া।

'বেশ।' মাথা দোলাল বদরু। হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'বড় সুন্দর হয়েছে দেখছি।'

হাসলেন হরিসাধন। নন্দন তার পাশে দাঁড়িয়ে। বললেন, 'এই নদা ওটা তৈরী করেছে।'

'না কি?' বদরুমিঞা দাড়ি নাড়িয়ে তাকাল নন্দনের দিকে। বলল, 'তারিফ করছি। লোকে বানায় কালো রঙের ছুতো হোলা দিয়ে। চূন দিয়ে নাক চোখ আঁকে। তাতে এক আছ্লা পানি হ'লে সে একেবারে কাঁদুনে-মাদুনে চেহারা দেখায়। এ দেখি পাকা রঙে কাজ।'

বদরুমিঞা কাকতাড়ুয়ার গোলাপী গালে, সবুজ ঠোঁটে, নীল হলুদের ছিট ছিট্ কপালে আঙুল ঘষে পরখ করল। তাতে কাকতাড়ুয়ার মাথাটা নড় নড় করল।

হেসে উঠল বদরুমিঞা! বলল, 'আচ্ছা হয়েছে বাবু। মানুষের কু'নজর আপনার তরিবাড়িতে পড়বে না!'

'আরে সেই। সেইজন্যেই তো।' দাঁড়িয়ে থেকেই হাত পা নাড়ালেন হরিসাধন। বললেন, কাকে কি বলা যায়! মানুষ আজকাল খুব, খুউব খারাপ হয়ে যাচ্ছে বদরুমিঞা। ওই দেখ না, ওই যে তালবোনার নীচে যে জমি—'

'হাঁ হাঁ।' বদরুমিঞা গোড়ালি উঁচু করে দেখতে চাইল।

কিন্তু রোদ চমকাচ্ছে আকাশের পটে। দশটা তালগাছের পাতার

তীক্ষ্ণ ফলাগুলিতে রোদের ছটা জ্যোতি হয়ে ফুটে আছে। ধুলো ঝাড়া, ময়লা ধোয়া ভাদ্রমাসের আকাশটা একটা সোনার পাত হয়ে গেছে। তাতে উড়ছে একটী বাদামী চিল!

কিন্তু এসব নয়, হরিসাধন বলছেন তাঁর জমির কথা, 'বুঝলে বদ্রুমিঞা, ওই জমিটা নিয়ে কি যে কেলেঙ্কারী চলছে।'

নীচে সব সবুজ আর সবুজ। ধানের চারারা বেড়ে উঠে কতদূর পর্যন্ত একখানা শ্যামল পুরু গালচের মত হয়ে আছে। তার মধ্যে কোনখানে কতটুকু ভূমিখণ্ড নিয়ে মানুষের অধিকারের লড়াই এখন যেটা হরিসাধনের, কাকতাড়ুয়ার ঠিক ঠিক জানা নেই। হয়তো বদরু মিঞাও ঠিক বুঝছে না। তবু তারা শুনছে, 'একদিন তো মারামারি হয়ে গেল। দিয়েছি লাঠির এমন এক ঘা যে ছ'মাসের এদিকে হাঁসপাতাল থেকে ব্যাটাকে আর উঠে আসতে হবে না।'

'কেন, কি হয়েছিল?' বদ্রুমিঞা শুধলো।

'আরে হবে আর কি? আমি ওই মাঠে চাষ করেছি ধান ফলিয়েছি আর লোক লাগিয়ে সে ধান কাটবে জমির কাগজে কলমে মালিক! তো কাকে কি বলা যায়। মন্দ লোকের কথা বলছিলে না বদরু তার শেষ নেই।'

'হাঁ। সেটা ঠিক।' বদরুমিঞা বিড়ি বের করে হরিসাধনকে দিল। নিজে ধরালো পেতলের লাইটার জ্বেলে। আগুনটা তারপর হরিসাধনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'মালিক কোন পার্টি'র লোক?'

'আরে, ওসব পার্টিফার্টি আমি বুঝি না।' হরিসাধন এক মুখ ধোঁয়া বাতাসে উড়িয়ে বললেন, 'আমার মেহনতে আমার দাবী। এই আমি বুঝি। আমি কোনো পার্টি-ফার্টিতে নেই বদরু।'

'তাহলেই তো মুসকিল বাবু।' বদরু ভাবনার গলায় বলল, 'কোনো না কোন পার্টি'তে থাকতেই হয় মানুষকে। না হলে বিপদে যে নিস্তার থাকে না বাবু।'

'আরে যা হয় হবে!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হরিসাধন বললেন, 'মামলা

মকদ্দমা হোক্। আমিও দেখবো, কদ্দূর কি হয়। চল, ঘরে চল, ওখানে যে বেগুনগুলো তোলা আছে সেগুলো দেখবে।'

'হাঁ হাঁ চলুন।'

কিন্তু যেতে গিয়ে বদরুমিঞা আর একবার তাকালো কাকতাড়ুয়ার দিকে। তারপর নন্দনের মুখে চোখ রেখে বলল, 'বুঝলে খোকা, এ হচ্ছে গিয়ে এক ঠেকন্। মন্দ লোকের চোখের চাউনিতে হিংসে ঝরে। আর হিংসে মানেই বিষ! বুঝলে?'

'না।' নন্দন মাথা নাড়লো।

'আরে মন্দলোক চোখ দিয়ে তাকাবে কি তোমার বেগুন গাছে পোকা লাগবে, সব ফুল ঝরে যাবে। সীম পাতা হলুদ হয়ে বোঁটা থেকে খসে পড়বে! লাউ হবে কুঠে কুঠে। এরা হল গিয়ে কুনজরে লোক। সেই তাদের জন্যে এই ঠেকন্‌টি তুমি ভালই করেছ খোকা। বেশ সুন্দর।'

হরিসাধন বললেন, 'চল্ নদা, ঘরেরগুলো বদরুমিঞার হাতে গচ্ছিত করে দিই। তাহলে আর বাজার যেতে হয় না। এ ভালই হল, মাল বয়ে নিয়ে যাবার ঝঞ্ঝাট তো কম না।'

'এইটিই হ'ল আসল কথা। কিন্তু সে কথা ক'জন বুঝে বলুন।' বদরুমিঞা কাকতাড়ুয়ার একপাশের ঘাসে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলল।

হরিসাধন হাঁটিতে শুরু করে বললেন, 'কাকে কি বলা যায়!'

আবার চারদিক নির্জন হয়ে গেল। কাকতাড়ুয়া একা সম্রাট। এসময়গুলোয় সে যা খুশী তাই করতে পারে। হয় জড়ের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, নয় ভাববে! বা কথা বলবে। কিন্তু কার সঙ্গে? কিসের সঙ্গে?

ভাদ্রমাসের রোদ আর গুমোটভরা এই দুপুরবেলায় সবাই হাল্কা ঘুমে ডুবে আছে। পাখি। গাছপালা। জীবজন্তু। আর মানুষ? কাকতাড়ুয়া জানে মানুষেরা ঘরে ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে? কাকতাড়ুয়ার কথা এই পৃথিবীর একটা মানুষের সঙ্গে হয়। সে হচ্ছে নন্দন। সে

এখন কি করছে? তাকে তো আজ আর হাটে যেতে হ'বে না। স্কুলেও যাওয়া নেই। তাহলে সে কি করছে?

কাকতাড়ুয়া নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটার উত্তর একান্ত মনে জপতে লাগলো, 'নন্দন তুমি এসো। নন্দন নন্দন...নন্দন, তুমি এসো। নন্দন...'

এইরকম এক ডাক খাওয়া শেষ হতেই কে যেন ডাকল বলে মনে হ'ল নন্দনের। বদরুমিঞা মালগুলি গরুর গাড়িতে তুলে নিয়েছে। বাবার হাতে সব টাকা। ঘরখানা যেন পরিতৃপ্ত, শান্ত। মা কাজে ব্যস্ত। বুড়ি পিসি মালা জপতে জপতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে কখন ঘুমিয়ে গেছে। তার দুই ঠোঁট হাঁ হয়ে গেছে। বাবার নাক ডাকার আওয়াজ থেকে থেকে উঠছে। তখনই যেন কানে বাজলো, 'নন্দন নন্দন।'

কে ডাকল বুঝল না সে। শুধু বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার দু'টো পা চলতে লাগল সেই তরিবাড়ীর পথে অজান্তে অদৃশ্য বোধে। নন্দন এসে পৌঁছল কাকতাড়ুয়ার কাছে। দাঁড়ালো মুখোমুখি।

কাকতাড়ুয়া হাসল। বলল, 'তুমি আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলে?'

'ও-ও।' নন্দন উজ্জ্বল মুখে হাসল। বলল, 'তুমি ডাকছিলে বুঝি। তাই!'

'কি তাই?'

'আমার নাম ধরে ডাকা শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'আর তুমি চলে এলে। একে তোমাদের ভাষায় কি বলে?'

নন্দন কাকতাড়ুয়ার মুখে এরকম প্রশ্ন শুনে প্রথমে হাঁ করে গেল। কিন্তু তার মনে এসে গেল মাষ্টার মশায় বি.কে. একদিন ক্লাসে এমনি ঘটনার কথা বলছিলেন।

নন্দন তাড়াতাড়ি বলল, 'থট্ রিডিং!'

'তাই হবে।' কাকতাড়ুয়া উদাস গলায় বলল, 'হয়তো তাই।

আমি ডাকলাম তুমি এলে। তুমি একটা মানুষ আর আমি একটা নির্জীব পদার্থ।'

কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে কথা হয় নন্দনের। কিন্তু আজকের কথাগুলো তাকে অবাক করে দিচ্ছে। তার যেন মনে হ'ল, কাকতাড়ুয়ার বয়স অভিজ্ঞতা খুউব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে। তার বি. কে. স্যারের কথা মনে পড়ে।

'লাইফ।' স্যার লাইফ সায়ান্স পড়ান তাদের ক্লাসে।

লাইফ হচ্ছে একটা ডায়নামিক প্রসেস্ অব রিভলিউশন।'

নন্দন পড়াশোনায় তেমন একটা ভাল ছেলে না। কিন্তু স্কুলের ত্'একটা কথা কি করে যেন তার কানের ফুটো দিয়ে ঢুকে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে এক জায়গায় চুপ করে বসে যায়। প্রয়োজনে সেগুলো হুবহু শোনায় বা দেখায়।

মাষ্টার মশায় এক হাত টেবিলে আর এক হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলছেন, 'বিবর্তনবাদ কথাটার মানে, মস্তিষ্কের উন্নতি। সেখানের স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীলতার অজস্র শাখা, প্রশাখা—'

কাকতাড়ুয়া যেন ক্রমে একটা পুরো মানুষ হয়ে যাচ্ছে তার কাছে। তাই সে বলল, 'এই শোনো শোনো, এসব কি তুমি বলছ?'

'বলছি এইজন্যে যে আমি ভেবে দেখেছি কাক আমি তাড়াই না। তাই আমার নাম কাকতাড়ুয়া হওয়া উচিত নয়। তারপর এই একটু আগে আমার নাম শুনলাম, ঠেকন। তাহলে আমি কি? আমার অস্তিত্বটা কিসের? এটা আমার এখন জানা বোঝা ভীষণ দরকার হয়ে উঠেছে নন্দন। তুমি আমাকে বল আমি কে ও কি?'

'তুমি কাকতাড়ুয়া।' নন্দন স্বাভাবিক গলাতে বলল, 'এই মাঠ পাহারাদার।' 'শুধু এই?' কাকতাড়ুয়া গভীর দুঃখে যেন মাথা কাত করল। বলল, 'আমি আর কিছু না? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি একটু ভেঙে বল!'

'ঠিক আছে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

নন্দন কাকতাড়ুয়ার চোখের সামনে বি. কে. স্যারের মত হঠাৎ আঙ্গুল তুলে বলল, 'আরে, কাক মানে এখানে পাখি নয়।'

'পাখি নয়!' কাকতাড়ুয়া যেন তালগাছ থেকে পড়ল।

নন্দন হেসে বলল, 'না। প্রতীক। মানুষেরা খুউব প্রতীক তৈরী করতে ভালবাসে। এই ধর না, যেমন পায়রা। তাকে সারা পৃথিবীর মানুষ শান্তির প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েছে।'

নন্দন কখন হাত নামিয়ে বাঁ দিকে হেলে দাঁড়িয়ে আছে। বি. কে. স্যারকে সে পুরো নকল করতে পারে। কিন্তু একথা সে নিজে ছাড়া কেউ জানে না। কেবল এই কাকতাড়ুয়ার কাছে সে যেন নিজেই বি. কে. স্যার হয়ে যাচ্ছে। তেমনি করে হাসছে।

নন্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'শোনো, তুমি তো আজকাল বেশ ভাল ভাবতে-টাবতে পারো। কথাগুলো ভেবে দেখো। আমাকে এখ্‌খুনি বাবার সঙ্গে শহরে যেতে হ'বে।'

শহরে! কেন? তোমাদের হাটের মাল তো সব ওই বদরুমিঞা নিয়ে গেল।'

'সেজন্যে নয়।' নন্দন খুব ভাবনার গলায় বলল, 'তুমি তো জানো কাকতাড়ুয়া, বাবা কি রকম এক একগুঁয়ে লোক। ওই যে তখন শুনলে, একটা লোককে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়ে বাবা খুব ঘাবড়ে গেছে। উকিলের কাছে বুঝতে যাবে। আজ যাচ্ছি কাকতাড়ুয়া।'

কাকতাড়ুয়া এখন চোখ নামিয়ে আছে। তার পায়ের তলায় একটা শর ঝোপ ঘন হয়ে বেড়ে উঠে জামার ঝুল ছুঁয়েছে। নন্দন কখন চলে গেছে। মাঝে দু'একবার ঝাপ্‌টা বাতাস দিয়েছিল। এখন কাকতাড়ুয়ার মাটির মাথাটা প্রখর সূর্যতাপে তেতে উঠেছে। মাথা জুড়ে আলকাতরার প্রলেপ গরম হয়ে ঘামের মত রসে যেন চলে

যাচ্ছে তার মস্তিষ্কে। জেগে উঠছে স্নায়ুমণ্ডলীর চক্রে তার সৃষ্টির, জন্মের কথাগুলি। খানিকটা মাটি, মনে পড়ে, সে ছিল মাঠমাঝে হাতি ডোবা পুকুরের পাড়ে। বেশ ভিজে নরম অথচ আঠাল মাটি। তাকে তুলে আনলো একটা শহর দেশের শেষ প্রান্তে ভূধর কুম্ভকার। তারপর মাটির তালকে টেনে-টুনে সমস্ত পাথর বেছে, সুতো দিয়ে কেটে কেটে খুব কোমল আর নরম করে তুললো। সেই মাটির তাল থেকে একটা একটা করে হাঁড়ির জন্ম। অনেকগুলি রোদে শুকোয়। তেমনি একদিন—

কাকতাড়ুয়া এতক্ষণে যেন ভাবনাটাকে ঠিক মত জায়গায় ধরে আনতে পারল। এই ভাবে তার মনে এলো, ভূধর কুমোরের উঠোনে পেয়ারা গাছে একটা ঝিংগে লতা উঠে হলুদ তারা ফুল ফুটিয়েছে। সেইদিকে তাকিয়ে ভূধর কুমোরের ক্লাস থ্রীতে পড়া একটি মেয়ে ছড়া বলছে। তার দাদা এই নন্দনের মতই বয়স, শুনছে।

মেয়েটি সুর করে করে বলছে :

"শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকুরে
আলুথালু ঘুমু যাও রোদ...গলা দুকুরে।"

কাকতাড়ুয়া ঝট্ করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল মাঠময় ঝিংগে ফুলগুলি এই দুপুরে কেমন হয়ে আছে। কিন্তু কাকতাড়ুয়া ভেবে দেখতে পাচ্ছে, সেই পেয়ারা গাছে সকাল রোদে ঝিংগের লতায় ফুলগুলিকে ও তার উপর উড়ন্ত হলুদ প্রজাপতিটিকেও।

কবিতা বলে চলেছে মেয়েটি :

"প্রজাপতি ডেকে যায়—
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়।'
আসমানে তারা চায়—
'চলে আয় এ অকূল!'
ঝিংগে ফুল!"

'সাবাস্। সাবাস্ কবি!' কাকতাড়ুয়া আপন মনে বলল, 'আমি

বেশ মনে করতে পারছি দাদা বোনকে শুধিয়েছিস কবির নাম। বোন বলেছিল, কাজি নজরুল ইসলাম!'

কাকতাড়ুয়া হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেল। চুপচাপ তাকিয়ে দেখলো, অনেক দূর আকাশে হাল্কা কয়েকটা মেঘের টুকরো। বাকী সবটা ঝাঁ ঝাঁ রোদে পুড়তে থাকা বিরাট ফাঁকা। নজরে একটা চিলও নেই। অথচ কাউকে, কিছুকে শোনাবার একটা ভাবনা তার মাথায় এসেছে। কিন্তু কেউ নেই। কিছু নেই। অথচ ভাবনা কথা হয়ে ফুটতে চাইছে। তাহ'লে?

কাকতাড়ুয়া নিজের চাদ্দিক দেখলো। তরিবাড়ীর গাছেরা। তাদের ফল-ফুল। লতা পাতা। এদের কারো সঙ্গে তার কথা হয় না। কেন? কারণ সে এদের রক্ষক। আর কাকতাড়ুয়ার মন বলল, 'রক্ষকের সঙ্গে অনুগতদের মনের কথা বলাবলি কখনো হয় না। এটা এই মাটির পৃথিবীর ইতিহাস।' এই রকম এক বোধ তার মধ্যে জন্ম নিল। লতায় পাতায় ঘুরছে কমলা রঙের পোকার দল, গঙ্গা ফড়িং কিছু, ফসলের পাতার কোরক খাচ্ছে এক ধরণের ডেঁয়ো পিঁপড়ে। কিংবা কালো সাদা অসংখ্য কীটপতঙ্গ ক্ষতি করে যাচ্ছে ফুল ফল ও ফসলের গাছের। কিন্তু এরা কেউ তাকে কেয়ার করে না। বরং তার ঘাড়ে মাথায় কানের ফুটো দিয়ে একেবারে ভেতরে চলে যায়। আবার বেরিয়ে আসে। এদের সঙ্গেও তার পরিচয় নেই। তাহ'লে যে গভীর কথাটা তার মনে হয়েছে সেটা সে কাকে বলবে? কাকে? একমাত্র নন্দন। একমাত্র চাঁদ। আর বলা যায়, কেবল নিজেকে একা একা। সে জানে না, ভুবর কুম্ভকারের হাতে বা পৃথিবীর যত মাটির তৈরী হাঁড়ির কি অবস্থা! সে শুধু নিজের অবস্থার দিকে তাকিয়ে তাই চুপ করে থাকল। তার দুঃখ হ'ল। কষ্ট হল। সেইসঙ্গে মেজাজটাও এই দুপুর রোদে টঙ্ হয়ে থাকল।

একটা কাঠ পোকা কোন্ অজান্তে তার কানে ঢুকে মাথার ভেতর হঠাৎ শব্দ করতে আরম্ভ করল, কট্ কট্ কটাস্। কটর্ কর্‌র্‌র্...'

একটানা এই শব্দে বিরক্তি ধরে গেল তার। তবু কাকতাড়ুয়া চুপ করে রইল। সময় বয়ে যেতে লাগল।

এই ফাঁকে মধুকুপি গাঁয়ের গরীবদের দু'টি সাত-আট বছরের মেয়ে বর্ষার মাঠে শাক্-পাতা তুলতে বেরিয়েছিল। তাদের খালি গা। কোমর থেকে ঝুলছে তালি মারা একটা প্যাণ্ট। কাঁখের ঝুড়িতে চারটি চারটি হিংচে কি শ্বেতপুরুনির শাক্। তারা দু'জনে সেই ছাগলে করা বেড়ার ফাঁক দেখতে পেল। সেখান দিয়ে ঢুকে পড়ল তারা। তাদের দু'চোখ যেন কোনো গুপ্তধন দেখলো—ওই সব বেগুন, ঢেঁড়স, মূলো, বরবটি, সীম, লাউ ইত্যাদির সমারোহে।

একটি মেয়ে সেই ধনরত্ন থেকে চোখ তুলে অন্যটিকে বলল, 'এই চম্পা চল, কেউ কোথাও নেই। আমরা দু'চারটা তুলে নি।'

মানুষের গলা কানে আসতেই কাকতাড়ুয়ার যেন জাগরণ ঘটল। সে শুনতে পেল অন্যমেয়েটি বলছে, 'ইস্! তাহ'লে আজ রাতে পেট ভরে খেতে পাবো কাজলি রে।'

'তাহ'লে চল্।'

'হাঁ চল্। তুলে নিয়ে ঝুড়ির উপর ঘাস ঢাকা দিয়ে ঘরে চলে যাবো।'

কাকতাড়ুয়া দেখতে পেল ওরা সেই বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

'তাহলে চল্।'

'তু আগে চল্।'

'না, তু আগে।'

'না তু আগে।'

ঝগড়া লেগে গেল দু'জনে।

একটা বাতাস উঠল। কাকতাড়ুয়ার হাতের আঙুলগুলি নড়ে উঠল পত্ পত্ করে।

অমনি মেয়েদুটির চারটি চোখ এসে পড়ল কাকতাড়ুয়ার উপর।

আর তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। কাকতাড়ুয়ার আঙ্গুলগুলি আবার ঝুলে গেছে!

চম্পা বলল, 'বাঁদর-খেদারা।'

স্বাভাবিক হয়ে গেছে কাজলীর মুখ। সে বলল, 'হাঁ। আচ্ছা করেছে লো!' 'হ্যাঁ লো!' বিষণ্ণ শোনালো চম্পার গলা।

'ক্রিং ক্রিং।'

টেলিফোন শব্দ নয়, একটা মস্তান ঝিঁ ঝিঁ মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার বাজনার তারে সুর বাঁধছে। শব্দ উঠছে, ক্র্যাং ক্র্যাং!'

চম্পা বলল, 'উসব জিনিসে ভূত থাকে।'

'ভূত থাকে!'

এই দুপুর রোদে আবার হাওয়ার ঝাপটায় কাকতাড়ুয়ার আঙুল দশটা নড়ে উঠল। যেন তাদের ডাক দিল।

আর মেয়েদুটি হঠাৎ বিষুটি খেয়ে চিৎকার করল, 'ওরে বাবারে—' তারপর ফাঁক করা বেড়া ভেঙ্গে ছুট মারল দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। কাকতাড়ুয়ার জীবনে এই প্রথম একটা ঘটনা ঘটল যাতে মানুষ তাকে ভয় পেয়ে ছুটে পালালো। এবং ব্যাপারটায় তার বেশ মজা লাগল। আবার হাওয়া এলো! আবার আসছে প্রত্যেকদিনের বিকেলের মেঘ! কাকতাড়ুয়ার হাতের আঙ্গুল, আলখাল্লার পোষাক নড়তে লাগল, উড়তে লাগল। ছুটন্ত মেয়ে দু'টি ছুটতে ছুটতে আর একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে পড়ি কি মরি করে আরো জোর ছুট শুরু করে দিল। যে দিকে এই মধুকুপি গাঁয়ের গরীব মানুষেরা থাকেন! কিন্তু তাদের পথ গেছে গাঁয়ের উঁচু তলার মানুষদের পাড়ার পথ ধরে। যার প্রথমটা হরিসাধন মোড়লের। পদবী তাঁর দাস, কিন্তু কেউ তাঁকে সে নামে ডাকে না!

কাকতাড়ুয়া সেই মোড়লদের তরি-বাড়ীতে দাঁড়িয়ে এমনি করে আঙুল, এমন কি মাথা নাড়িয়ে নন্দনদের বুড়ি ঝিকে ঘাস করার নামে ঢুকে কত ফল ঝুড়ির তলায় লুকিয়ে নিতে দেখেছে। বুড়ি তাকে

মোটেই ভয় পায়নি। পায় না। অথচ এরা পেল!

মুহূর্তে কাকতাড়ুয়ার কি হ'ল সে আকুল গলায় জোরে বলে উঠল, 'এই শোনো শোনো, আমি একটা কিছুই না। তোমরা ভয় পেয়ো না। এসো।' কিন্তু কাকতাড়ুয়ার স্বর ওদের কাছে পৌঁছতে যাবার মাঝখানে হঠাৎ ভেঙেচুরে শুধু শব্দ হয়ে গেল, 'ক্রাং ক্রাং!'

বৃষ্টি এলে ঝিঁঝিঁ মহাশয় বর্ষা রাগিনী মল্লারে তার বাজনা বাজাবে! এখানের আকাশ এখনো রোদময়। ভ্রমর প্রজাপতি মৌমাছির দল পেট ভরে ফুলের মধু লুট করে নিচ্ছে। গিরগিটিতে একটা ঘাস-ফড়িং কপ্ করে খেয়ে নিয়ে রঙপাল্টে হয়ে গেল বেগুনী-লাল।

কাকতাড়ুয়ার মন নামের ব্যাপারটা কোথায় ক্লান্ত হয়ে উঠল। উদাসী। সে হঠাৎ, নিজের মাথার ভেতরটায় ঢুকে গিয়ে তার গঠন প্রক্রিয়ার দিকে মনযোগ দিল।

একটা বুনো মাকড়সা বিশাল এক বেড়া জাল পেতে ফেলেছে রাতে বেড়াতে আসা জে'নাকীদের ধরবার জন্যে। অদ্ভুত রূপোলী তারের এই জালখানি বড় বিচিত্র নক্সায় তৈরী। কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতর আবছা অন্ধকার। কানের জায়গার ফুটো দিয়ে আলোর আভা ঢোকে। তাতে দেখা যায়, কয়েকটা শুঁয়োপোকা গুটি বেঁধে নিজের চারদিকে পর্দা খাটিয়ে দিয়েছে কবে প্রজাপতি হবে ভেবে! আর আছে একদল পিঁপড়ের সারি। তারা তাক্ খুঁজছে কি করে মাকড়সাটাকে মেরে তাদের বাসার খাবার ঘরে শীতের সঞ্চয় করা যায়! এই রকম একটা জায়গায় কাকতাড়ুয়ার ভাবনা চিন্তাটা চলে আসতেই কাকতাড়ুয়া নিজেকে জোর করে হঠাৎ জড় করে দিল। বিকেল ফুরিয়ে এলো। বাতাস থেমে গেছে। মেঘ আসতে আসতে আজ আর এলো না।

চাঁদ উঠে এলো পূব দিক থেকে গোল হয়ে। পরিষ্কার আকাশে হাসির কিরণ ছড়িয়ে তেঁতুল গাছের মাথার উপর থেকে চাঁদ কাক-তাড়ুয়াকে ডাক পাঠালো, 'হোই, চলে এলাম। তোমার গল্প শুনবো।'

একটি মাটির হাঁড়ি। অনেকগুলো ঘটনার জীবন পেরিয়ে আজ

কাকতাড়ুয়া হয়েছে। তাই তার জন্ম বিবরণে আছে দিনযাপনের বৈচিত্র্য। সেগুলোই গল্প। তার ধারাবাহিকতায় আছে সেই ভূধর কুম্ভকারের ভাঁটায়পুড়ে লাল হয়ে, শিল্পী গুপী দত্তের তুলির ছোঁয়ায় শিউরে উঠে তারোপরে প্রভাতীর সঙ্গে মিলে মিশে অন্য একটা জীবনে চলে যাবার কথা।

কিন্তু কাকতাড়ুয়া বলল, 'শোনো, আগে তোমাকে আমার একটা ভাবনার কথা বলি।'

আজ পূর্ণিমা। চাঁদ সারা রাত এই আকাশে থাকবে। তার সঙ্গে অনেক কথা হবে।

কাকতাড়ুয়া তাই গল্প বাদ দিয়ে একটা অন্য কথা তুললো। বলল, 'এই যে দেখছো, যা দিয়ে আমার শরীর গড়া পৃথিবীর মাটি, বুঝতে পারছ?'

'তুমি বলে যাও।'

'প্রকৃতির সব জীব এই মাটির তৈরী। জন্ম নেওয়া আর মরে যাওয়া ব্যাপারটা এক জায়গাতেই আছে। কি বল তুমি?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি একটু খুলে বল।'

'আরে খুলে বলার কিছু নেই ভাই। ব্যাপারটা আমার কাছেও ঠিক স্পষ্ট নয়। আসলে জানো, আজ আমার এক কবির কবিতা মনে পড়েছিল। তিনি এই মাটিতেই জন্ম নিয়েছিলেন, আবার এই মাটিতে ফিরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার বস্তুগত সম্পর্ক একই। বল, ঠিক কি না?'

চাঁদ চুপ করে থাকলো। কারণ এতো ভারি ভারি কথা সে ঠিক বোঝে না। বোঝে পাপিয়ার গান, যুঁই মালতী রজনীগন্ধার ফুটে ওঠা, নদী সমুদ্রের জলের হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া।

কাকতাড়ুয়া একটু হাসল। বলল, 'যাকগে, ওসব বাজে কথা। বরং শোনো আমার জীবনের কথা কিছু তোমাকে বলি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভালো।' চাঁদ পূর্ণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমি তোমাকে বলব প্রভাতীর সঙ্গে মিশে থাকা আমার জীবনের দিনগুলোর কথা।'

মধুকুপি গাঁয়ের হরিসাধন মোড়লের মেয়ে প্রভাতীর বিয়ে হ'ল খুউব ঘটা করে। শহর থেকে জেনারেটার এনে তিনি ঘরে বিজলীর আলো জ্বেলেছিলেন। বাজিয়েছিলেন শহরের 'জয় মা কালী' তাসা পার্টি'র হিন্দী গানের ছমক ছমক বাজনা! সে এক সুন্দর জীবন। তার গায়ে আঁকা রঙিন ছবি। ভেতরে ভরা মিষ্টি। এই জীবনের অনুভবগুলো সে বলতে পারবে না। তাই সে চাঁদের কাছে আরম্ভ করল প্রভাতীর বাপের বাড়ীতে ফিরে আসার ঘটনার থেকে।

সে বলল, 'তারপর প্রভাতী এক একদিন গায়ের লতায় পাতায় ফুলে, প্রজাপতির ছবিতে আঙ্গুল বুলিয়ে দিত। বুঝলে চাঁদ, সে সব সময় বিশ্বাস কর, আমার শরীরের অণুপরমাণুতে বয়ে যেতো একটা তরঙ্গ। কিন্তু কি সেটা তখন বুঝতাম না। তবে আজ বুঝি। বেশ ভাল করেই বুঝি। আসলে কি জানো, আমি ঠিক জানি না, কেমন করে আমার মধ্যে একটা জাগরণ ঘটে গেছে। তার মানে, আমি যেন একটা প্রাণী হয়ে গেছি। যে ভাবতে পারে, কারো কারো সঙ্গে কথাও বলতে পারে। আচ্ছা চাঁদ, পৃথিবীতে অন্য যে সব মাটির হাঁড়ি তাদের কি এমন হয়?"

চাঁদ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এখন হঠাৎ প্রশ্নে সে যেন একটু দুলে উঠে কথা বলল, 'তোমার মাটির খবর আমার কিছুই জানা নেই বন্ধু। ওসব প্রশ্ন আমার কাছে বৃথা।'

'তাও তো বটে!' কাকতাড়ুয়া ভাবনার গলায় বলল, 'দাঁড়াও, নন্দন এলে শুধিয়ে নেবো আমার এই যে চেতনা আছে সেটা কোন্ ঘটনায় জেগে উঠেছিল।'

চাঁদের একতিল দাঁড়াবার কোনো জায়গা এই আকাশ-পথে কোথাও নেই। সে কেবল ঘুরে যাচ্ছে পৃথিবীটাকে। তার পাহাড় নদী সহর গ্রাম এই কাকতাড়ুয়া সবার উপর রাতের বাতি হবার কাজ।

দূরত্ব বেড়ে গেল চাঁদের সঙ্গে কাকতাড়ুয়ার। তার কথার শব্দ আর যেতে পারল না। ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল মাঝ পথে 'ঝনন্ ঝন-ন্, ঝনন…'

এই শব্দ একটানা। কি হল? কাকতাড়ুয়ার মাথার মধ্যে আরম্ভ হ'ল। সেই ঘাস ফড়িংটা এখন ঝিঁঝিঁট রাগে ঝালা তুলেছে। বিশাল আসর। মাকড়সা, পোকা আর জোনাকীরা রয়েছে। আড়ালে বসে কান পেতে শুনছে ঝিঁ ঝিঁনির দল। কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতরটা একটা কারখানা হয়ে গেছে! সেখানে একটা আলো জ্বলছে দিপ্ দিপ্ করে।

জোনাকীর আলো অতীতের স্মৃতি টেনে আনে।

কাকতাড়ুয়ার মনে পড়ল গুপী দত্তকে।

দেখে বোঝা যাবে না। কিন্তু কোমর পর্যন্ত অবশ মানুষটি তার গায়ে রঙের পর রঙের তুলি বুলিয়ে যাচ্ছেন নিজের ঘোরে। মাঝে মাঝে কথা বলছেন, 'যাও। চলে যাও শুভ কাজে। আমার বন্ধুর বিয়েতে। তোমার হাঁড়ি জন্ম অন্যরকম হোক্।'

ছড়াৎ করে ছবি কেটে যায়। উড়ন্ত আলোটা কৈ? ধরা পড়েছে জোনাকী মাকড়সার ফাঁদে। তার পা ডানায় বেঁধে গেছে আঠা মাখা রূপোলী সুতো। তার ফলে জোনাকীর আলো নিভু নিভু। মাকড়সাটা তবু তার ফাঁদের এই জায়গাটার দিকে বার কয়েক ছুটে এসে আবার ফিরে গেছে মধ্যেখানে। শেষকালে সে এসে মরিয়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জোনাকীর উপর। নিভে গেল আলো।

আর সেই অন্ধকারে ফড়িংয়ের ডানায় বাজতে আরম্ভ করল প্রকৃতির দরবারী কাণাড়া রাগ। অদ্ভুত গম্ভীর, বিষাদ, ধীর লয়। প্রাণ মুচড়ে ওঠা সুর বাজাচ্ছে রাত গভীরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা, ওস্তাদ শিল্পী।

এখন ধীরে ধীরে যেন অন্ধকারের পর্দার উপর ছবি ফুটল। এই কাকতাড়ুয়ার জীবন ইতিহাস। যা সে ভাল করে গুছিয়ে কাউকে

কোনো দিন বলতে পারবে না, নিজে ভাবতেও পারবে না। সেই ছবি দেখল সে।

শুভকাজ শেষ হল। বর বউ বিদায় নিল। মিষ্টি শূন্য হাঁড়িটি সেই ঘরের একটা মন্দির চেহারার দেয়াল তাকে তোলা।

তার নীচে রয়েছে একটুকরো হলুদ কাপড়ের দুই প্রান্তে গোবরে কড়ি গুঁজে তার উপর তেল গোলা সিঁদুরের ধারার একটা শুভ ও শান্তির প্রতীক। এই রকম জায়গায় হাঁড়িটি রয়েছে। রয়েছে যেন সুখে ঘুমিয়ে।

কিন্তু একদিন তার ঘুম ভাঙলো প্রভাতীর ছোঁয়ায়। এ যেন সে নয়। এ ঘর থেকে সে গিয়েছিল রানী সেজে। এখন ফিরেছে ন্যাতা কানি হয়ে। এসে থেকেই এ ঘরটা ছেড়ে প্রায় বেরুয় না। বসে থাকে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে। যেন সে মানুষ নয়, একটা মূর্তি। শুধু জানালা দিয়ে একটু জোর বাতাস এলে যখন ওর রুখু চুল ওড়ে, শাড়ির আঁচল নড়ে তখন মনে হয় প্রভাতী রয়েছে এই ঘরে।

হয়তো সে উঠে আসবে হাঁড়িটির কাছে কোন এক সময়। তারপর তার গায়ের সুন্দর লতা পাতায় একই রকম হাত বুলিয়ে বলবে বল, তুই কেন? এখানে আর কেন? তারপর কান্না।

কিন্তু কেন, কি জন্যে তার এই কান্না, সে কখনো বলে না। হাঁড়ি শুধু অচেনা ব্যথার একটা শিরশিরে অনুভবে থাকে। যা দেখা যায় না। বোঝা যায় না। আসলে ব্যথার সঙ্গে পরিচয় নির্জীবের মনেও থাকে। পাথর তাই বাধা দেয়। নদী ফুসিয়ে বাঁধ ভাঙ্গে। মাটি ফেটে আগুন উগড়ে দেয় পৃথিবীর বুকের আগ্নেয়গিরি।

এইসব বিষয়গুলো কেবল মাত্র টুকরো টুকরো ছবিতে এলো গেল কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতর এক আধুনিক প্রেক্ষালয়ে।

আর এর পরের দৃশ্যেই দেখা গেল প্রভাতী উঠল তক্তার থেকে। বিছানায় চাদর এলোমেলো। ময়লা।

প্রভাতী এলো বসুধারা চিহ্নের উপরে হাঁড়িটির কাছে। তারপর

তাকালো তার দিকে। চোখে পলক পড়ছে না। মুখখানা কি রকম এক লাল মেঘ! প্রভাতী এমন ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো আজ। তারপর হঠাৎ সে হাঁড়িটির গলা চেপে দু'হাতে ধরল। সেই তাকের ঘর থেকে তুলে এক রকম পাগলিনীর মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেল। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। তারপর কোনো কথা না বলে সে খুব কাঁপা হাতে আবার সেই জায়গায় ওটাকে রাখতে গেলে দেয়াল কোণে ঠোকা খেল হাঁড়ির গা। ওই জায়গাটা ভূধর কুম্ভকারের ভাঁটায় আপোড়া থেকে নরম হয়েছিল। এখন এক চাক্‌লা তার থেকে ছেড়ে গেল। নজর দিল না প্রভাতী। ফিরে গেল তার তক্তায়। এমনি করে একটা একটা দিন গেল। তার পরের দিন…

ছবি ঘর বন্ধ হয়ে গেল। সকাল হয়েছে। এবার বাইরের দিকে তাকাবার সময় এল। কাকতাড়ুয়া কাজ খুঁজলো। কিন্তু তার কাজ এই ফসল রক্ষা করা। হরিসাধন মোড়লের তরিবাড়ী পাহারা দেওয়া। দিচ্ছে সে। বাঁদর আর একদিক পানে হাঁটছে না। ফল ফুলের ক্ষতিকারক পাখিরা দূরে রয়েছে। ছাগল গরু এপাশে এসে পড়ে হঠাৎ অতি নিরীহের মত ভীতু পায়ে বেড়ার পাশে পাশে চলে যাচ্ছে!

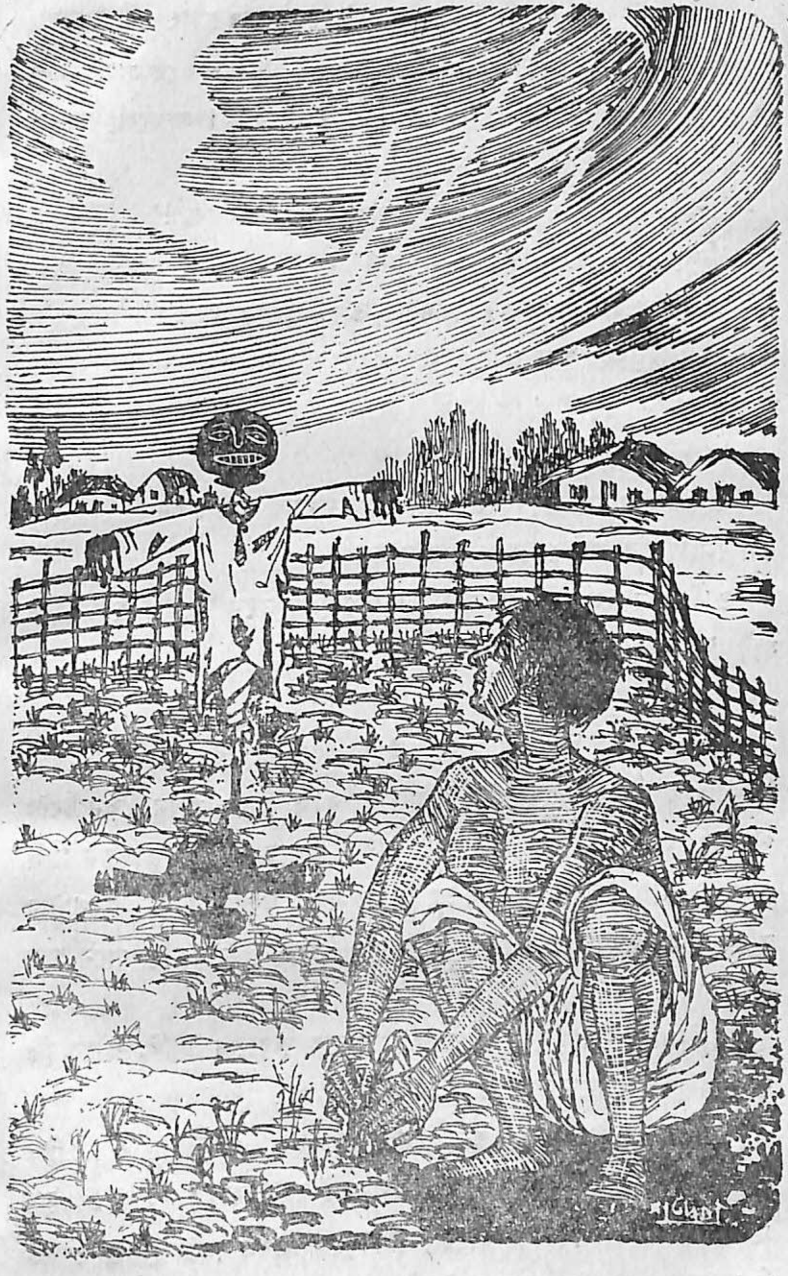
সে তার কাজ ঠিকঠাক করছে। এই ভেবে সে দেখলো কখন বাপ বেটায় এখানে এসে নিজেদের কাজে লেগেছে।

নন্দন চেঁচিয়ে বলছে; 'হ্যাঁ গো বাবা, সাতপাতি কাঁকুড়ের ফুল সব ঝরে যাচ্ছে কেন গো?'

'কৈ কৈ? দেখি দেখি।'

হরিসাধন মোড়ল আগাছা ছিঁড়ছিলেন কুমড়ো গাছের গোড়ার মাটি থেকে। তিনি উড়ে এলেন নন্দনের কাছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন ফুলগুলি। হাত দিয়ে নাড়লেন দু'একটা। তারপর তাকালেন ফসলের মাঠময়।

নন্দন তাঁর পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে।



হরিসাধন মোড়ল স্থির চোখে সব দিক দেখে হঠাৎ খেপে গিয়ে বললেন, 'পোকা। পোকাতে সব সব্বোনাশ করে দেবে রে নদা! নদা রে, কাকে কি বলা যায়।' 'কেন বাবা, এতো পোকা লাগলো কেন? নন্দন বাবার মুখে চোখ তুলে বলল।

'বিষ্টি। বিষ্টি্র। বুঝলি? কাকে কি বলা যায়!'

'কিন্তু কাল তো বিষ্টি হয় নি বাবা।'

'আরে কাল। সেটা একটা দিন। তার আগের আগের দিনগুলো। শালা, বিষ্টিতেই অদ্দেক গাছের পাতা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বলে। তা পোকা তো হবেই।'

'তাহলে?'

কাকতাড়ুয়া এতক্ষণে নজর চালিয়ে দেখলো কত রকমারী পোকার দল নিলে ফুল ফল খেয়েছে সারারাত।

হরিসাধন মোড়ল বললেন, দেখি চল্, দু'জনে মিলে চাষ অফিসে যাই।'

'চল।'

নন্দন হাতের মাটি ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর কাকতাড়ুয়ার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থামল। কাল রাতে কখন যেন দুটো প্যাঁচার মারামারি হয়েছিল তার মাথার উপরে। দুটোর ওজন ছিল বেশ। ঝাপটা ঝাপটিও কম হয় নি। তাই কাকতাড়ুয়ার মাথাটার দড়ির বাঁধন ঢিলে হয়ে এক কাতে হেলে গেছে। নন্দন সেখানে হাত রাখলো।

হরিসাধন মোড়ল দূর থেকে চিৎকার করলেন, 'বলি, কাকে কি বলা যায়। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলি যে!'

'এর মাথাটা কাত্ হয়ে গেছে বাবা। একটু দাঁড়াও। ঠিক করে বেঁধে দিই।' কখন হয়েছিল এই ব্যাপারটা? সন্ধে হতেই। তখনো চাঁদ ছিল তেঁতুল গাছের আড়ে। এখন সেটা সোজা হতেই ঢিলে হয়ে গেল মাকড়সার তৈরী স্নায়ুগুচ্ছ, কাত হয়ে গেল গুটির

ভেতরের পোকা! ব্যথা লাগল নাকি কাকতাড়ুয়ার ?

জানার সময় নেই। কথা বলারও না। তাড়াতাড়ি দড়ি কষে বেঁধে দিয়ে চলে গেল নন্দন।

একটা হাওয়া উঠল শন্‌শন্‌ করে। মেঘ নেই শুধু হাওয়া। ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ করল পাতার দল। বাতাসের ঝাপটা খেয়ে উড়ল ফড়িংয়েরা। কাকতাড়ুয়ার আঙুলগুলো পতপত করে নড়ল। তার জামার ভেতর হাওয়া ঢুকে ঢোলকের মত ফুলে থাকল।

ক'দিনেই কলার কাঁদি গাছের কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে। পেঁপেরা হয়ে উঠেছে ফুলো ফুলো গালের চিবুক নীচে ঢেউ। এসবে পোকা লাগেনি। লেগেছে ঝিংগে, ঢেড়স, বেগুন, সীম, এই সব মরশুমী ফসলে। কাল ছিল গুটি কয়েক। আজ হয়ে গেল লাখে লাখ। সত্যি অতিবৃষ্টি ফসলের শত্রু। হরিসাধনের কথাটা নিয়ে আনমনে হাল্কা করে ভাবছিল কাকতাড়ুয়া। বেলা বাড়ছিল। সকাল ফুরিয়ে দুপুর নামলো। বাতাসটা কি রকম বৃষ্টির গন্ধ বয়ে আনতে লাগলো। দিনের আলো দুপুর মুখে আবছা হয়ে এলো। পোকারা পাতার তলায়, মাটির গর্তে চলে গেল। ফড়িং প্রজাপতির দু'চার ঘরাণা যারা বর্ষা না ফুরতেই হাজির হয়ে গেছে, উড়ন্ত প্রাণী, তারা এবং পাখিরা আশ্রয়ে চলে গেছে। চারদিক কেমন নিঝুম।

ঠিক এমন সময়ে এই তরিবাড়ীর একদিকের বেড়া ধরে দাঁড়ালো একটা গাট্টাগোট্টা লোক। গোঁফ দু'টো কশ বেয়ে নিচে নেমে এসেছে। চোখ দুটো জ্বলছে।

কাকতাড়ুয়া শুনতে পেল লোকটা বলছে, 'বাঃ অনেক কলা! বড় বড় কাঁদি।'

'হেই খবরদার!' কাকতাড়ুয়া ওর মতলব বুঝে হাঁক ছাড়ল।

কিন্তু লোকটার কানে গেল না। সে লোলুপ চোখে কলার কাঁদিগুলোর দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে, 'বেশ বেশ, আর ক'টা দিন যাক: তারপর দেখছি সবগুলোকে।'

'খবরদার!' আবার হাঁক পাড়ল অসহায় কাকতাড়ুয়া। কারণ বাতাস নেই। তার ভয় দেখাবার অস্ত্র আঙ্গুলের লতা, ঢোলক জামা অকেজো, নিথর।

লোকটা ফিরে তাকালো পেঁপে গাছগুলোর দিকে। তারপর নিজের পেছন দু'হাতে থাবড়ে বলল, 'বাহ্ বাহ্। পেঁপে! পেঁপে সব কেঁপে উঠেছে। বাহ্। বলিহারী যাই। একদিন রাতের বেলায় শালা সব ঝেঁপে দেবো। এহ্ এহ্...'

সে এমন করে হাসলো যে তার মুখের পানের রস রক্তের মত চিবুক দিয়ে নেমে এল। লোকটা চলে গেল গূঢ় একটা মতলব মাথায় নিয়ে। বৃষ্টি এলো ঘন ঘোর করে। খুব জোর বর্ষণ শুরু হ'ল। মনে হতে লাগল এ বৃষ্টি বুঝি আর ছাড়বে না। এমন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মোটা মোটা মেঘের পাথর ঠোকাঠুকির ভয়ঙ্কর শব্দ বয়ে যাচ্ছে চারপাশে। গতকাল জল ঢালতে না পারায় শোধটা আজ অগাধে মিটিয়ে নিচ্ছে। শব্দ উঠছে, 'কল্ কল্ কল্।'

নালা ভরে জল বয়ে যাচ্ছে। দিনকে রাত ভেবে বর্ষা মেঘের আনন্দে তরি-বাড়ীর ব্যাঙেরা কটা কট্ ডাকতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কাকতাড়ুয়া কোথাও ভিজে চুপসে কোথাও বা ফুলে উঠে শুধু বৃষ্টি পড়া গায়ে মাখছে। তার মনে পড়তে থাকছে, কাল রাতে একটা জোনাকী, আলোর কণা, মাকড়সার ফাঁদে নিহত হয়েছে!

একটা অজানা কষ্ট, কি যে ব্যথা এই বৃষ্টির সময়ে তার মনকে ভারি করে রাখলো। জল জমে খড়ের হাতগুলো তার ফুলে উঠেছে। আঙ্গুলগুলো জামার পাকে পাকে বাঁধা পড়ে গেছে।

কিন্তু বেশীক্ষন এ রকম থাকল না। ঝাড়া তিন ঘন্টা অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরিয়ে মেঘগুলো সব আকাশ ছেড়ে চলে গেল। দিনকে দেখা গেল বিকেলের শেষ রঙে রঙিন হয়ে উঠতে! তারপর সন্ধ্যে নামলো। অন্ধকার। অবসাদ। ঘুম।

কিন্তু ঘুম নয়। কাকতাড়ুয়া তাকিয়ে থাকল চাঁদ ওঠা

আকাশের দিকে। চাঁদ উঠল আজ একটু দেরীতে ওই ঝাউপসী গাছটার উপরের আকাশে। কাকতাড়ুয়া তাকে প্রথম সম্ভাষণ জানালো, 'এসো এসো চাঁদ। আমি তোমার জন্যে আকাশে তাকিয়ে আছি।'

চাঁদ হেসে বলল, 'ধন্যবাদ।'

কাকতাড়ুয়া মাথায় করে নিল চাঁদের আলোর ছোঁয়া। কাছে এল চাঁদ। বলল, 'হ্যাঁ, তারপর থেকে বল শুনি তোমার গল্প।'

'তারপর তারপর—'কাকতাড়ুয়া গভীর স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, 'কোথায় যেন, কোনখানে তোমাকে বলা থামিয়েছিলাম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে এই আমার বর্তমান চেহারার যে কানের ফুটো—'

'বাহ্‌ বাহ্‌।' চাঁদ খুব প্রশংসার আলোয় সেই ফুটো ভরে দিল। বলল, 'খুব সুন্দর। এতে তোমার চেহারাটা তোমার সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। শোনো শোনো, আমার বাচ্চাদের জন্যে একটা ছড়া বানাতে ইচ্ছে করছে। তুমি শুনবে?'

'বল।'

'কিন্তু ছড়াটা তোমাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে ছড়া!'

কাকতাড়ুয়ার চোখ মুখ ভেঁচ্‌কে গেল।

চাঁদ বলল, 'হ্যাঁ শোনো।'

তারপর চাঁদ দুলে দুলে ঘুম পাড়ানি সুরে ছড়া বলা শুরু করল।

'মাটির হাঁড়ি উল্‌টো মুখো
কানের ফুটো
একটা।
কাঠের ঠেকে দাঁড়িয়ে থাকো
মিথ্যে মানুষ
বলব নাকো
যতই ধর ভয়ভুতুসী
ভ্যাক্‌টা॥'

কাকতাড়ুয়া হাসল। বলল, 'বাহ্ বেশ হয়েছে। কিন্তু চাঁদ এসময়—আমার জীবনের একটা দারুণ ঘটনা তোমাকে বলবার সময়।'

দারুণ ঘটনা বল বল!'

চাঁদ হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল।

'কিন্তু তুমি যে ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে।'

'ও কিছুই নয়।' চাঁদ গম্ভীর গলায় বলল, 'ভুলে যাও সব। বল তোমার জীবনের দারুণ ঘটনাটা শুনি!'

খুব করুণ ঘটনা চাঁদ।' কাকতাড়ুয়া ব্যথার স্বরে বলল।

'ওহো।' চাঁদ কিছু না জেনেই তার কষ্ট প্রকাশ করল। বলল, 'বল বল শুনি।'

'এই যে কানের ফুটোটা, যে দিন প্রভাতী সেই অজান্তে ধাক্কা মেরে করে দিয়েছিল, সে সময়, হয়তো জানো চাঁদ, হয়তো নয়, আমার ঠিক মনে হয় আমি অনেকখন অজ্ঞান হয়েছিলাম! যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমার ভেতর কনকনে ঠাণ্ডার স্রোত ওই ফুটো দিয়ে ঢুকছে। আমি বুঝেছিলাম। সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল, আমি অন্যরকম হয়ে গেলাম। অন্য একটা কিছু'

কাকতাড়ুয়া একটু চুপ করল। তার মনে পড়ল, সেটা ছিল মাঘ মাসের সব চেয়ে শীতের দিন। সে ভাবল, মধুকুপি গাঁয়ের পূর্বদিকের ওই নদীর উপর থেকে সেদিন কুয়াশা হয়তো কিছুতেই সরছিল না। যেন কোনো ভারি ধূসর পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল চারদিকের দৃশ্য। হয়তো ছিল তেমনই কোনো দিন। কেননা, সে তখন একটা ঘরের ভেতর বদ্ধ হাঁড়ি। বাইরের এমন মাঠে, আকাশের তলায় জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে, দিনের আলোয় বা মেঘের ছায়ায় তার দাঁড়িয়ে থাকা ছিল না। সে ছিল নির্জীব এক মাটির হাঁড়ি। সেই জীবনের করুণ ঘটনাটি কিভাবে আরম্ভ করা যায় ভাবছিল কাকতাড়ুয়া।

আর শেয়ালের হাঁক উঠল পশ্চিম ডহরের ছেলে পোঁতার গর্তে।

চিলের বাচ্চা কাঁদলো মাঠ পুকুরের তালগাছের মাথায়। কুকুর ডাকল মধুকুপি কোন এক পাড়ায়। আকাশের উত্তরকোনায় চিকুর হানছিল থেকে থেকে একুটুকরো মেঘ। কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

কাকতাড়ুয়া কথা বলল 'পরের দিন মানে, আমি সেই সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিনটার কথা বলছি, আমার জ্ঞান ফেরার পর থেকে প্রভাতীকে এই ঘরে ঢুকতে দেখি নি। দেখলাম যখন ঘর অন্ধকারে ভরে গেছে। রাত্রি বেলা। সে একটা হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে এল। তারপর দরজা বন্ধ করল। আমার নিজের শরীরে তখন একটা খুঁত হয়েছে বলে হয়তো আমি ওকে তেমন গরজ করে দেখি নি।'

চাঁদ একটু উপখুস করল। বলল, 'আমি কিন্তু একটু একটু করে অনেক সরে গেছি। তোমার কথা শব্দ হাল্কা শোনাচ্ছে।'

ঠিক ঠিক।' কাকতাড়ুয়া সময় সচেতন হয়ে বলল, 'আমি আমি ঘটনায় একেবারে চলে আসছি। প্রভাতী দরজা জানালা বন্ধ ঘরে সেই আলোয় একবার আমাকে দেখলো। কিন্তু ছুঁল না। শুধু সামনের দড়িতে ঝোলা একখানা সাড়ি একসময় টেনে নিল। তারপর কাঠের একটা চেয়ার ঘরের মাঝখানে টেনে আনলো—'

'শুনতে পাচ্ছি না। কথা শোনা যাচ্ছে না। তুমি থেমে যাও-ও-ও।'

অনেকদূর থেকে চাঁদের স্বর ভেসে এলো আলোর হাল্কা তরঙ্গে।

উত্তর কোনার মেঘ আবার হু হু করে ছুটে আসছে এই দিকে। চাঁদ চাপা পড়ে গেল তার তলায়।

কাকতাড়ুয়ার মনে হ'ল, এটাই ঠিক হলো। যে কথা কিছুতেই ঠিকমত করে কাউকে বলা যাবে না তার চেষ্টার হাত থেকে সে বাঁচলো। মেঘে মেঘে একটু আগের আলোর রাত ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে গেল। বাতাস হু হু করে বইতে লাগল। বিদ্যুৎ ছটা চমকে চমকে উঠে একটানা গুরগুর শব্দ বইয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত ঘটল না। শুধু কাকতাড়ুয়া নিজের অতীত স্মৃতির দরজা খুলে একা একা দেখলো প্রভাতীকে। প্রভাতী-প্রভাতী···?

যেন কার ডাক। আসলে কাকতাড়ুয়া বুঝল এটা তারই স্বর অচেনা স্তরে চলে গেছে।

'তারপর কি হ'ল?' কাকতাড়ুয়া সেই স্বরে যেন শুধলো, প্রভাতী, তারপর তুমি কি করলে?'

এইসব কেবল ভেবে নেবার বিষয়। কাউকে বলে বোঝাবার নয়, এমন কি নিজেকেও না। কারণ সেই ঘটনাটায় কাকতাড়ুয়ার হাঁড়ি জীবন কী রকম হতচেতন হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র একটি মাটির হাঁড়ি। যার ফুটো দিয়ে যেন হাওয়ার হিম শরীর এসে তার প্রাণশক্তিকে হিমায়িত করে দিয়েছে! কাকতাড়ুয়ায় পূর্ব জীবনের এই অবস্থাটা কেটেছিল পরের দিন সকালে যখন দরজা ভেঙে ঘরে লোক ঢুকল। আলো ঢুকল। তখন একটু একটু করে সে বোধে ফিরে এসেছিল। দেখতে পেয়েছিল, ভিড় করা মধুকুপি গাঁয়ের মানুষের মাঝখানে গলায় দড়ি বেঁধে চালের সাঙা থেকে ঝুলছে প্রভাতী!

কাকতাড়ুয়া ভাবনার জগতটার চাকায় ঘচাং করে যেন জাম্ ধরে গেল। খুবজোরে বাতাস বওয়া শুরু হ'ল। মেঘ সব উড়ে গেল। ফুঠে উঠল দূর আকাশে চাঁদের হাসি। তার নিচে দিনের দেশ রাতে রহস্যময় বন জঙ্গল। তালগাছ লম্বা, অচেনা মূর্তি।

কাকতাড়ুয়ার মুখ দিয়ে হঠাৎ শব্দ বেরুলো. 'পরিবর্তন! এইভাবে সব কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। আমার জীবনেরও। শুধু মেঘ করছে, ছেড়ে যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে না। বৃষ্টি···বৃষ্টি...বৃষ্টি...'

কোন্ মন ভুলে কাকতাড়ুয়া হঠাৎ পেয়ে যাওয়া শব্দটা জপ করতে করতে এদিক ওদিক চোখ চালাতেই দেখলো একটা শেয়াল তার দিকে তাকিয়ে আছে। সারা শরীর ঘন অন্ধকারে গড়া শুধু চোখ দু'টো জ্বলছে। কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই সে হঠাৎ দু'পা তুলে বিনীত প্রণাম জানিয়ে বলল, 'পেন্নাম হই গো গোদাপায়ের নাথি। খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্। ভালো আছেন?'



কাকতাড়ুয়ায় ছিরখুটে দাঁতগুলো বেশী করে ফুটে উঠল। চোখের মণির গোল দু'টোর একটায় জোনাকী পিট্‌পিট্‌ করছে। সে খুব রেগে উঠে বলল, 'কি বললে? গোদা পায়ের লাথি! মানে?'

'একটা প্রবাদবাক্য।'

'তার মানে?'

'আজ্ঞে গপ্প।'

'গল্প!'

'আজ্ঞে না গপ্প।'

'ওই একই হ'ল।'

'আজ্ঞে না আলাদা।'

'কি রকম?'

'সে আজ্ঞে ছেলে বুড়ো সবাই খুব মন দিয়ে শুনবে। অথচ বিশ্বাস করবে না।'

'বটে বটে। তবে গল্পটা কি জিনিস্?'

'সেটা যে পড়বে বা শুনবে, সেই-ই বিশ্বাস করবে।'

'বাহ্।' কাকতাড়ুয়া শেয়ালকে খুব তারিফ করল। বলল, 'সাধে ওই মানুষজাতের জীবগুলো তোমাদের নাম দিয়েছে শেয়াল পণ্ডিত। তুমি খুব জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি আছ হে। বল বল শুনি তোমার গপ্প!' অতএব উপায় নেই। শেয়ালকে পণ্ডিতের মত বসতেই হয় কাকতাড়ুয়ার চোখের সামনে একটা বাঁধানো বেদির উপরে। যার উপর নিমগাছটা উঠে গেছে ডালপালা ছড়িয়ে। তাদের ফাঁকে আলো এসে শেয়ালের দুই চোখে যেন চশমা এঁটে দিল। কাঁধে ফেলে দিল পাট করা এক চাদর।

শেয়াল পা ঝুলিয়ে বসে দু'হাত হাঁটুতে রেখে বলল, 'সে ছিল একটা গাঁ। সেখানে ছিল জাঁদরেল গোছের একটা লোক। এখানে জাঁদরেল শব্দের মানে, আমি বলতে চাইছি, তার পায়ে ছিল বিশাল এক গোদ।' গোদ! গোদ!' কাকতাড়ুয়া বার দুয়েক শব্দটা উচ্চারণ

করে বলল, 'মনে পড়েছে। ভূধর কুম্ভকারের পায়ে একটা ছিল।'

শেয়াল প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে থামো থামো। এ যে সে গোদ নয়। পাটা তার ফুলে ফুলে এই জাঁদরেল মোটা হয়ে উঠেছিল। এমন মোটা যে আমি বলতে পারি, পাঁচটা শেয়াল একদিনে সেটা খেয়ে শেষ করতে পারবে না!'

'আরে বাস্! দারুণ একখানা গোদা পা তো!'

হ্যাঁ-এ, তবে আর বলছি কি? আর সেই গোদের উপর ছিল আলুর মত গোল গোল নরম সব মাংস পিণ্ড। উহ্, এগুলো খেতে যা আরাম লাগে না—'

শেয়ালের দু'চোখ ঢুল ঢুল দেখালো।

'তুমি খেয়েছো?'

'না।'

শেয়াল চোখ খুললো।

'তাহলে কি করে জানলে এগুলো খেতে আরাম লাগে?'

'আহ্ কিছু বোঝে না। একেবারে মেঠো জীব। কল্পনা, বুঝলে কি না গল্পের জন্যে এসব কল্পনা করে নিতে হয়। তবে এ গল্পে খাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আছে অন্য একটা ব্যাপার।' শেয়াল হাত উঠিয়ে গালটা চুলকে নিল। আর যেন সেই জন্যেই তার জ্যোৎস্না গড়া চশমাটা নেমে এল একেবারে নাকের ডগায়।

শেয়াল এমনি ভাবে বলল, 'জানো কাকতাড়ুয়া আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। গর্তে লেজ ঢুকিয়ে অনেক চেষ্টায় দুটো কাঁকড়া ধরেছিলাম। একটা তার চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।'

'ওহ্-হ। খুব কষ্ট।' কাকতাড়ুয়া খিদেটিদে কাকে বলে ঠিক বোঝে না। তবে বোঝে নিজের জিনিস হাত ছাড়া হয়ে যাবার ব্যথা।

শেয়াল বলল, 'তো কি করা যায়। শোনো, গল্পটা বলি। সেই জাঁদরেল তার বউ ছেলে মেয়ে এমন কি যে কেউ তার রাগের সময়,

বুঝতে পারছ, সেই জাঁদরেল রেগে গেলে, হ্যাঁএ, বলতো—দেবো, এই পায়ের এমন একটা লাথি যে তখন বুঝবি।'

'তা বটে, তা বটে।' কাকতাড়ুয়া কোন এক ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা করল। শেয়াল বলল, 'হ্যাঁ-এ। পা খানা সত্যি বিশাল। তোমার মাথায় পড়লে ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে। বুঝতে পারছ? আর আমি তো তার তলায় কোথায় চাপা পড়ে যাবো তার ঠিক নেই। দেখে ভয় তো সবাই পাবেই। কিন্তু একদিন কি হ'ল জানো, একটা সাহসী যোয়ান বয়েসেয় মানুষ বুক ফুলিয়ে তার সামনে চলে এসে বলল—প্রত্যেকদিন বলে মারবে পায়ের লাথি। দেখি মারুক, মারুক আজ। ওই গোদা পায়ের, দেখি, কত শক্তি।'

'তারপর?'

'তারপর' আর কি? এই যেমন তুমি। একটা ভয় দেখাবার সঙ্‌ সেজে বসে আছো। কাজে কিছুই করতে পার না। এটা আমি জানি বলে চললাম শশার খেতে। কচি কচি অনেক শশা ফলেছে। দেখি, ওগুলো খেয়ে পেট ভরানো যায় কি না।'

শেয়াল স্থপ্‌ করে নেমে পড়ল মাটিতে। চলল হরিসাধনের শশার খেত তছনচ করতে। কিন্তু কাতকাড়ুয়ার কিছুই করার নেই! তার মনে হ'লো, এই তরি-বাড়ী রক্ষার মহান দায়িত্বে সে অনেক ক্ষেত্রেই গোদা পায়ে লাথি।' পোকা। ইঁদুর। মানুষ চোর। একে একে ভেসে এলো ছবিগুলো। ছেঁড়া খোঁড়া। দ্রুত গতিতে। কেননা, পুব আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। পাখিরা ডাক তুলেছে। দিন আরম্ভ হ'ল।

সকাল থেকে হরিসাধন মণ্ডল তরি-বাড়ীতে কীটনাশক যজ্ঞ শুরু করলেন। অনেক লোক আর জিনিসের নানা রকম কাজ কারবারে জায়গাটা ভরে উঠল।

হরিসাধন মোড়ল চেঁচাতে লাগলেন, 'ভাল করে দাও। বেগুন বাড়ীতে ভাল করে স্প্রে মারো। এতো পোকা। শালা, কাকে কি

বলা যায় ? আচ্ছা আচ্ছা এদিকে এদিকে···

মাঠময় ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। সঙ্গে তাঁর পিঠের যন্ত্রে বিষ গোলা জল হাতে বড় বড় টিউব নল নিয়ে লোকেরা যাচ্ছে। আসছে। আবার দূরে যাচ্ছে। নন্দনও ভীষণ ব্যস্ত ওদের সঙ্গে।

তারই একসময় কাকতাড়ুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন ব্লকের এ, ই, ও, সাহেব। প্যান্টের পকেট থেকে হাত বের করে আঙুল তুলে বললেন, 'এটা কি ?' হরিসাধন মোড়ল ; খুব তুচ্ছ করা গলায় বললেন,'ওই নদা করেছে একটা। চলুন। ওদিকে চলুন। শশার খেতটা আপনাকে স্যার, 'দেখাই।'

তবু এ, ই, ও, সাহেব দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর পাশে নন্দন। তিনি বললেন আপন মনে, 'কাকতাড়ুয়া। এ স্কোয়ার ক্রো !'

হরিসাধন বললেন, 'ওই যা বলেন স্যার !'

তারপর তিনি ছটপট করে এগিয়ে গেলেন। কাকতাড়ুয়া যেন বুঝতে পারে হরিসাধন মোড়ল তার কাছে আসতে চান না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর বুঝি প্রভাতীকে মনে পড়ে। খুব কষ্ট হয় ?

কাকতাড়ুয়ার ভাবনার জায়গাটা ঠিক কাজ করছে না। সে শুধু দেখছে কয়েকজনের হাতে টিউব থেকে অষুধ গোলা জল সাঁ সাঁ করে পড়ছে গাছের পাতায় ফুলে ফলে। কোথাও ধোঁয়ার মত উড়ছে অষুধের গুঁড়ো। ভারি হয়ে যাচ্ছে ঝাঁঝাল গন্ধে বাতাস। ওরা কীট নাশে লেগেছে। কাকতাড়ুয়া চুপচাপ। নীরব। নিস্তব্ধ।

ওদেশ কাজ শেষ হ'ল। চলে গেল ওরা। ফুরিয়ে গেল দিন। রাত এলো কালো হয়ে। কাকাতাড়ুয়ার চারপাশে আজ মৃত্যু-যন্ত্রনায় শব্দ শুধু। অন্য কিছুই নেই। তাই মনে পড়ে অতীতকে। প্রভাতী শূন্য সেই ঘর। দরজা জানালা খোলা হচ্ছে না। কেবল সন্ধেবেলায় প্রভাতীর মা এসে সেই চাল সাঙ্গার নীচে পিদিম জ্বালিয়ে কাঁদছেন।

তাঁর মুখ দিয়ে বিড় বিড় শব্দে শুধু উচ্চারণ হচ্ছে, 'প্রভাতী প্রভাতী প্রভাতী ...'

চাঁদ এলো অনেক দেরী করে। আজ তার ভাঙা চেহারা বেশ স্পষ্ট। আলোর ছটা কম। কিন্তু মেজাজ তার ঠিক আছে। বলল, কি বন্ধু, কেমন আছো ?'

'ভালো নেই। একেবারে ভাল নেই চাঁদ।'

'কেন ? কি হ'ল আবার ?'

চাঁক কাছিয়ে এলো।

আজ এখানে মৃত্যুপুরী চাঁদ। ভাল করে শোনো, শুনতে পাবে কত জীবের প্রাণ যাবার কষ্টের শব্দ উঠছে। তারা বুক ফাটা যন্ত্রনায় কাঁদছে। শোনো। 'হ্যাঁ। তাইতো।' চাঁদ যেন খুব কাছে ঝুঁকে এল। বলল, 'কি করে,

কি করে এসব হলো ?'

খুব ব্যথার গলায় কাকতাড়ুয়া বলল, 'আমার চারপাশে আজ ওরা বিষ ছড়িয়েছে।'

'বিষ ! কেন ?'

'ফসল বাঁচাতে। তাই দেখ কত সব পোকার শরীর মরে পড়ে আছে। হায়, রাতচর কোনো প্রাণীই আজ আর এমুখো হবে না চাঁদ। বড় খারাপ সময়। কথা কইতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।'

চাঁদ কিছু বলল না। আস্তে আস্তে সরে চলে গেল দূরে। তারারা মিটমিট করতে লাগল কান্নার আগে পাতা কাঁপা চোখের মত। ম্লান জ্যোৎস্নার আকাশ দিগন্তের কোলে। সেখানে রহস্যের ওপারের ঢেউ খেলানো অন্ধকারের চূড়োয় থমকে আছে চাঁদ। এ সময় একটা বিষ-মাতাল শক্ত পোকা কাকতাড়ুয়ার মাথার উপরে ঝপ্ করে পড়ল। তারপর গোঁ গোঁ শব্দে পাক্ খেয়ে লাগল পা গুলি শূন্যে মুঠো করে।

...কতদিন, কতদিন ছিল সেই হাঁড়ি একা একা প্রভাতীর ঘরে ? মনে নেই, মনে নেই। শুধু ভাবা যেতে পারে, দিনে রাতে প্রভাতীর

অদৃশ্য চলা ফেরায় জেগে উঠে সে তাকে দেখেছে। না, তাকে নয়। দু'টো পা সাড়িতে বেঁধে যে মানুষ প্রাণীটি ঝুলে আছে কড়ি-কাঠে। হাঁড়ির চোখ তখনো আঁকা হয় নি স্পষ্ট করে। তবু যেন ছিল কিছু চোখ, যার সামনে সেই পা দুটোর ভয়ঙ্কর ঝাঁকরানি। এক সময় উঠেছিল। তারপর থেমে গিয়েছিল। একদিন তো প্রভাতী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মায়া দিয়ে গড়া তার শরীর। এপার ও ওপার দেখা যায়। তেমনি হাত তুলে তার গায়ের নক্সাগুলো ছুঁয়েও আছোঁয়া রেখে বলেছিল, 'তবু তোকে আমি ভালবাসি রে সোনার হাঁড়ি। ভালবাসি।'

খুউব···খুউব মনের ভেতরের একটা কথা চুপি চুপি কাকতাড়ুয়ার ভেতরে নদী স্রোতের মত বইতে আরম্ভ করল, 'ভালবাসি। প্রভাতী। ভালবাসি। প্রভাতী।'

আর কাকতাড়ুয়ার স্মৃতির পটভূমিকায় ফুলে উঠল সেই দৃশ্য যেখানে রয়েছে, প্রভাতীর ঘরখানা আবার একদিন সব জানলা দরজা খোলা হ'ল। তার যা কিছু নিজের ছিল যেমন ওই বালতি ব্যাগ, সুটকেশ, আলনার পোশাক সব এ ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হ'ল হৈ হৈ শব্দে।

একজন সেই হাঁড়িটা তুলে নিয়ে বলল, 'এটা ?'

কারা যেন বলল, 'ফেলে দাও। ভেঙ্গে গেছে।'

একটি কিশোর গলা কান্না চাপতে চাইবার চেষ্টায় চিৎকার করে, বলল 'না !' তারপর সে এগিয়ে এসে বলল, 'দাও। আমাকে দাও।'

বুক জুড়ে নন্দনের ছোঁয়া এখনো লেগে আছে।

কাকতাড়ুয়া হঠাৎ বিনম্র শব্দে বলল, 'মানুষ যাকে ভালবেসে ছোঁয় সেই ই প্রাণী হয়ে যায়। আহ্ আহ্, মানুষ, নন্দন, এখন তোমাকে আমার খুউব কাছে পাবার দরকার ছিল। আমার এই দেখাগুলো তোমাকে আমি বলে যেতাম। তুমি শুনতে। আমাকে একা একা

ভাবতে হতো না। ভাবতে....'

মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নন্থ, ওটা নিয়ে তুই কোথা যাচ্ছিস!'

বাবা ডাকলেন কাঁপা গম্ভীর গলায়, 'নদা। নন্দন!'

এক ঘর লোক চুপচাপ। নন্দন হাঁড়িটিকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। তার হৃদয়ের স্পন্দন-শব্দের তরঙ্গ, হাঁড়ির অণুতে পরমাণুতে ঢুকে যাচ্ছে।

টপ্‌টপ্‌ করে কয়েক ফোঁটা শিশিরের জল পড়ল কাকতাড়ুয়ার মাথায়। তারার কান্না! কিন্তু সে মগ্ন।

নন্দন বলল, 'আমি, আমি, একে রাখবো মা। রাখবো বাবা।'

মা বাবার সঙ্গে অনেকেই কোরাসে বললেন, 'যাও যাও।' শব্দ দু'টো একটা শোকের গান হয়ে গেল। নন্দন হাঁড়ি নিয়ে এল ওদের দাওয়া পেরিয়ে উঠানে। সেখানে ধানের মড়াই, রান্না চালা, সজনে গাছ, কুঁয়োতলা। দিনের ঝলমলে আলোয় সব সুন্দর রোদ মাখা। হাঁড়ির গায়ে কণায় কণায় সূর্য শক্তির অণুগুলি ঢুকে যেতে লাগল। বেড়ে উঠল চেতনা। দেখবার ভাববার বিচিত্র এক ক্ষমতা আরো গভীর হ'ল! সে দেখলো নন্দন তাকে নিয়ে উঠানের একদিকে কুলগাছ পাশে বেঁকে এল একটা ঘরে। যেখানে থাকে গরু মোষের দল। তারি একটা নীচু মাচায় হাঁড়িটিকে তুলে রেখে চলে গেল।

তারপর গোবরের ঝাঁঝাল গন্ধ ভরা একটা পরিবেশে তার সময় কাটতে লাগল। মশার একটানা আওয়াজ, ঝিঁঝিঁর শব্দ, বাদুরের ওড়াউড়ি, চড়ুইয়ের ডাক এই সবের মধ্যে কতখন আধো-বাঁচা আধো-মরার মত কাটলো হাঁড়ির। এর মধ্যে পরিবেশের যা কিছু ঘটলো তার মন ছুঁলো না। শুধু সে জাগলো যখন, একটি প্রদীপ হাতে মা ঢুকলেন গোয়ালে। সে আলো পড়ল দু'হাত জোড় করা প্রণাম শেষে প্রদীপটি নামাতে গিয়ে হাঁড়িটির উপরে।

মা দেখতে পেলেন। আর হঠাৎ এমন এক কান্না তাঁর বুক দিয়ে উঠে এল যাতে কোনো কথা নেই। আছে শুধু শব্দ। সেই শব্দের বাতাসে প্রদীপটি গেল নিভে। অন্ধকারে ভরে গেল গরু-মোষের ঘরখানা। এখন সেগুলো বসে! আলো অন্ধকারে এখন তাদের কোনো বিকার নেই। মা কাঁদছেন, ফুঁপিয়ে।

অন্ধকার। নিঃসঙ্গতা। কান্না।

হাঁড়ির পরমানুগুলি বুঝি কেঁপে উঠল! আর সে স্পষ্ট দেখতে পেলো প্রভাতী এসে মায়ের শরীর জড়িয়ে ধরল সেই রকম আবছা এক শরীরে। যার কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ আছে, সেই চেহারা কোনো এক জায়গায়। আকাশে। আলোর অচেনা তরঙ্গে। যেখানে প্রতিটি ঘটনার ছবি ছাপা হয়ে রয়ে যাচ্ছে। কোন মহা-জাগতিক যন্ত্র তার অসীম ক্ষমতায় এইসব কাজ করে চলেছে জানে না কাকতাড়ুয়া। তবে তার মনে হ'ল, সেই সব শক্তি প্রাণীরা স্মৃতি হিসেবে কিছু পায়। পেয়েছে সে। দেখছে—

প্রভাতী বলল, 'মা, মাগো! কেঁদো না মা।'

মা বলছেন অচেতনের মত, 'প্রভাতী প্রভাতী।'

প্রভাতী বলছে, 'মাগো, শোনো শোনো। তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম।' মা একটা বাঁশের খুঁটি জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কি কথা মা? কি কথা, মা আমার? প্রভাতী!'

মা গো, তুমি ওই হাঁড়িটাকে একটু দেখো মা।'

'কিন্তু পিদিম নিভে গেছে যে রে প্রভাতী।'

'সে দেখা নয় গো মা। সে দেখা নয়। আমি ওকে ভালবাসতাম। তাই, কখনো, ওকে ছুতো হাঁড়ির দলে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিও না মা। ওকে নিয়ে তুমি একটা কিছু করো।'

'কি করবো মা, কি করবো?' মা আকুল গলায় শুধালেন।

প্রভাতী মাকে ছেড়ে তাঁর সামনে এলো। বলল, 'আমি জানি না। তুমি না পারলে ভাইটিকে বলো।'

প্রভাতীর ঘাড় আবদারী মেয়েটির মত বাঁকানো। চারদিকে

অদ্ভুত শব্দ। অসংখ্য মশারা উড়ে বেড়াচ্ছে ঘর ময়। লেজের ঝাপটায় গরু মোষগুলি সেই মশা তাড়াচ্ছে। এই সব শব্দের সঙ্গে মিশে রয়েছে কোন দেওয়ালে ইঁদুর মাটি কাটার কটর্ কটর্ আওয়াজ।

তার মধ্যে প্রভাতী মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে করুণ গলায় বলল, 'আমার এই কথাটি মনে রেখো মা। ওকে যেমন করে হোক্ দেখো!'

শেষ রাতে কাকতাড়ুয়া এই সব যখন মনে করছিল তখন নন্দন একটা স্বপ্ন দেখছিল।

সে শুয়ে রয়েছে মায়ের পাশে। একটা তক্তপোশে বিছানায় দু'চোখ বোজা অনড় শরীর। তবু সে দেখছে, কে একটা বুড়ো, গায়ে তার ছেঁড়া কোট। মুখের চেহারায় অনেক রেখা আঁকা। চোখ ভেতরে ঢুকে যাওয়া। রুখু চুলের সেই মানুষটা তাকে আঙ্গুল ইশারায় ডাকছে। আর ফিস্ ফিস্ করে বলছে, 'শোনো শোনো। আমার কাছে এসো।'

নন্দন পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে এলো।

লোকটা বলল, 'আমি তোমাকে কতগুলো কথা বলতে চাই।'

'বল।'

লোকটা একটু চুপ করে থাকলো। চারদিকের পরিবেশ কি-রকম না-আলো না অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে।

লোকটা কথা বলল, 'আচ্ছা, তুমি শুধু শুনতে চাও, না দেখতে চাও?'

নন্দন খুব অবাক হ'ল। বলল, 'কি? জিনিসটা কি?'

রহস্যময় এক হাসি নিয়ে সে চোখ নাচালো। তারপর হাল্কা গলায় বলল, 'সে যা হয় একটা কিছু। আগে তুমি বল কি করতে চাও? দেখতে না শুনতে?' 'ঠিক আছে। দেখাও।'

নন্দন দেখলো লোকটা হঠাৎ একটা সবুজ পাতার গাছ হয়ে গেল। গাছটার নাম গুলঞ্চ। লতা নয়। বৃক্ষজাতীয়। প্রদীপের মত পাতাগুলিতে শাখা প্রশাখা ভর্তি। কিন্তু যেন ম্যাজিকের গাছের মত পাতাগুলি হঠাৎ কোন এক সোঁ সোঁ বাতাসে খসে পড়ল

একসঙ্গে। শুধু নেড়া নেড়া ডালে লেগে রইল একটি মাত্র সবুজ কিশলয়! বাতাস বইতে লাগল তেমনি জোরে! কাঁপতে লাগল দুর্বল পাতাটি। মনে হ'ল বোঁটা ছিঁড়ে ওটাও এবার খসে পড়বে। ঠিক সেই সময় গাছের জায়গায় লোকটা ফুটে উঠল। বাতাস টাতাস কিছুই নেই।

বুড়ো লোকটি হেসে বলল, 'আমি কিন্তু ওই পাতাটাকে খস্তে দেবো না। আমার শক্তি দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখবো। বুঝলে হে কিশোর, সামনে এখন অনেক বড় ঝড়। অনেক পাতা খসা।'

এই রকম একটা স্বপ্নের মধ্যে নন্দন ডুবে থাকলো শেষ রাতের অনেকক্ষণ।

কাকতাড়ুয়ার ভাবনা-চিন্তার সীমা বেড়ে যেতে লাগল। নন্দন স্বপ্নটা ঘুম থেকে উঠেই ভুলে গেল। দিন চলে যেতে লাগল একটার পর একটা। বেড়ে গেছে শর ঝোপটা বিশাল হয়ে। মনে হচ্ছে লম্বা লম্বা শিষ তুলে ওটা একদিন কিছু সাদা মেঘ আকাশ থেকে বিঁধিয়ে টেনে নেবে। ফসলগুলির অবস্থা ক্রমে জমকালো হয়ে উঠেছে। নীরোগ বেগুনগুলো বেলুনের মত দেখাচ্ছে। শশাগুলি নিটোল ঘন সবুজ। কলার কাঁদিগুলি কি রকম এবার মাটি ছোঁবে হে? পেঁপেগুলির গায়ে যে হলুদ রঙ লেগে গেছে!

জমিতে সার মাটি, গাছে পোকা মারা অষুধ। ফসলের বেড়ে ওঠা ফুলে ফলে তরিবাড়ী উপ্‌চে ওঠায় আর কোনো বাধা নেই। প্রহরী রয়েছে কাকতাড়ুয়া দিন রাত খাড়া দাঁড়িয়ে। তাহলে আর ভাবনা কি?

নন্দন এলো স্কুলের ছুটির একদিন খেয়ে দেয়ে, দুপুর বেলায়। ইচ্ছে, আজ সে কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে অনেক গল্প করবে! কিন্তু এসে দেখলো কাকতাড়ুয়া কালো মাথা বেশ কিছুটা সাদা হয়ে উঠেছে।

নন্দন আঙুল তুলে বলল, 'আরে, এটা কি হল?'

'বকে পায়খানা করে দিয়ে গেছে।'

'বক! বকের পায়খানা!' নন্দন চোখ এগিয়ে বলল, 'আমি

ভাবলাম বুঝি তোমার চুল পেকেছে। কিন্তু বক এখানে এল কি করে?'

উড়ে।'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ।' নন্দন খেঁচিয়ে উঠে বলল, 'বক তো উড়েই আসবে সে আমি জানি। কিন্তু এল কেন? তাই বলছি।'

'পরিদর্শন করতে!' কাকতাড়ুয়া গম্ভীর গলার উত্তর দিল।

'কি বললে?'

'বলছি তো পরিদর্শন করতে! এখানের চারপাশে কি সব রয়েছে দেখতে, জানতে!' নন্দন হঠাৎ অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে দাঁড়ালো। বেঁকে গেল কোমর। আকাশের দিকে হাত তুলে নির্দেশ আঙ্গুল উঁচিয়ে দিয়েছে। যার অনেক উঁচুতে সত্যি এক টুকরো সাদা মেঘ ভাসছে একই সরল রেখায়। সামনে শরৎ। তারই নিশান ওটা! কাকতাড়ুয়া হাসল। বলল, 'কি হল নন্দন, তুমি হঠাৎ এরকম স্ট্যাচু হয়ে গেলে?' নন্দন হাত নামিয়ে স্বাভাবিক দাঁড়িয়ে বলল, 'বক তো নদীর ধারে নামে। এখানে তার কি?'

'না না। এটা হচ্ছে একরকম মেটে রঙের কোঁচবক। পুকুরের ধারে চরে।' 'ও-ও। তাই বল।' নন্দন মাথা দোলাল। বলল, 'তা ওটা এই আমাদের তরি-বাড়ীতে এসেছিল কেন?'

'কাদার মধ্যে ঘুরঘুরে পোকা, ব্যাঙ ছানা খোঁজ করতে।'

'বুঝলাম বুঝলাম।' নন্দন জোরে জোরে মাথা দোলালো। বলল, 'তারপর কিছু তার জুটলো?'

'না।' কাকতাড়ুয়ার দীর্ঘশ্বাসেই হয়তো তার নাকের নীচে বসে থাকা এক চিত্তির বিচিত্তির রঙের ডানা কাঁপিয়ে উড়ে গেল! কাকতাড়ুয়া ম্লান স্বরে বলল, 'আমার মাথায় অনেকখন বসে থেকেছিল। আর লম্বা গলা বাড়িয়ে চারপাশ দেখেছিল। শেষ এই করে চলে গেছে!'

নন্দন হাসল। বলল, 'ভালই হ'ল তুমি বুড়ো হয়ে গেলে। চুলে তোমার পাক্ ধরলো!

হঠাৎ নন্দনের মনে এলো স্বপ্নটা। তার মনে হ'ল সেই বুড়োটার চেহারা যেন এই কাকতাড়ুয়ার মতই ছিল! ঠিক অমনি একখানা সাদা চুল মাথার মাঝখানে। ছেঁড়া পোশাক।

কাকতাড়ুয়া বললো, 'আমার জীবন খানা তাই তো একটা গল্পের মত নন্দন।' 'হ্যাঁ তাই।' নন্দন একটু এদিক ওদিক করে বলল, 'জানো, সেই তোমাকে গোয়ালের মাচাতে যেদিন রাখলাম তার পরদিন থেকে মা আমাকে প্রায় তোমার কথা বলতো।'

'কি বলতেন?

'নতু, এই হাঁড়িটা দিয়ে তুই একটা কিছু কর বাবা। একটা ভাল কিছু।' 'ভাল কিছু!'

দুপুর আকাশ গভীর জলের মত নীল। বাতাস বইছে সুন্দর। পাখি ডাকছে। গানের সুরে।

নন্দন বসলো সামনের উঁচু মত ঘাস ঢিপিটাতে। বলল, 'হ্যাঁ। আর আমার মাথায় ভাবনা ঢুকে থাকল কি করি। তোমাকে নিয়ে কি করি।' সে একটা শরপাতা নখ দিয়ে কেটে নিল। বলে চলল, একবার ভাবলাম ঠাকুর ঘরে লক্ষীর আসনের পাশে তোমাকে রাখি। কিন্তু পিসি সেটা পছন্দ করবে না।'

আর সেটা ভালও হতো না। কেন না, আমার তো একটা দিক ফুটো।' 'হ্যাঁ, তাও বটে। তো একবার ভাবলাম খামারের যে ছাতিমগাছটা আছে তার নীচে তোমাকে রাখবো। ওখানে একটা বেদী করব। তার উপর তুমি থাকবে। যাকে বলে, দিদির ওটা একটা স্মৃতি ফলক হ'বে। সারা শরৎকাল ছাতিম ফুল তোমার উপরে ঝরে পড়বে দিনে। আর রাতে তার গন্ধ ছুটে যাবে অনেক অনেক-দূরে। দিদির কথা তখন সব চাইতে বেশী করে মনে পড়বে।'

যেন মাথাটা নেবে যাবে মাটির দিকে। তারপর ফেটে যাবে মাটি চৌচির হয়ে। যেন তার ভেতরে তলিয়ে গিয়ে বুকভাঙা ব্যথার হাত থেকে বাঁচবে কাকতাড়ুয়া। কিন্তু তা তো হবার নয়। সে শুধু নন্দনের কথা শুনে যেতে লাগল। 'তাই আমি সেদিন—'

কাকতাড়ুয়া তার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'তুপুর বেলা।

নন্দন বলল, 'কেউ কোথাও নেই।'

'চারদিক ঝিম্ ধরে আছে।'

'একটা পাখী গুব্ গুব্ করে কি রকম আওয়াজ করছে।'

'ডিমে তা দেবার জন্যে পুরুষ কাকটা—'

'মেয়ে কাকটাকে ডাকছে।'

কথা কাড়াকাড়ির খেলা খেলতে বসল তু'জনে। এই খেলা তাদের খুব প্রিয়। তুজনের একটা জানা জিনিষকে টুকরো টুকরে কথায় ভেঙে ভেঙে খেলা করা। কতদিন তারা তুজনায় বসে শুধু একজনের কথার সঙ্গে কথা যুগিয়ে গেছে। তাতে অদ্ভুৎ সব ব্যাপার ঘটেছে। কত আজব বিবরণ। কিন্তু আজ নন্দন সে পথে না হেঁটে সোজাসুজি ভাষায় মনের ভাবটা গর্‌গর্ করে বলে গেল, 'দেখ কাকতাড়ুয়া, ওসব কথা ছাড়ো। যেটা মূল কথা, আমি তোমাকে মাচা থেকে নামিয়ে হঠাৎ কি জানি কোন খেয়ালে শুধিয়েছিলাম—কি শুধিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে কাকতাড়ুয়া?'

'আছে।'

'বলতো শুনি।'

'তোমর প্রশ্ন ছিল, আমি ছিলাম বিয়ের হাঁড়ি। সেটার বদলে এক মাঠ পাহারাদার হ'তে চাই কি না?'

'উহ্ উহ্।' নন্দনের সর্বাঙ্গে যেন বিছিতি লাগল। কিন্তু তা নয়। সে বলে উঠল, 'বাপরে বাপ। এমন ঘোর প্যাঁচ বাক্য ব্যবহার। একি কাকতাড়ুয়া, এ রকম ভাষার কথা বলা তুমি আবার কখন থেকে শিখলে?' 'বুড়িয়ে গেছি কি না। যাক্‌গে, তখন যে ব্যাপারটা আমার হয়েছিল সেটা তোমাকে বলি নন্দন। তুমি তো সেই আমার ফুটো জায়গটার মধ্যে তোমার কথাগুলো ঢুকিয়ে দিলে। আর জানো তার একটা শব্দ, একটা মাত্র শব্দ ওই পাহারাদার, আমার ভেতর পাক্ খেয়ে একটানে ঘুরতে লাগল—'পাহারাদার পাহারাদার পাহারাদার।' একটানে শব্দটাকে বলে একটু থামলো কাকতাড়ুয়া।

তারপর স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'জানো, কেন জানি না, তখন এই পাহারাদার শব্দটাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র শব্দ বলে আমার মনে হয়েছিল। আমি সেটা উচ্চারণ করতে চাইছিলাম। প্রাণপণ চেষ্টায় কথা বলে উঠতে চাইছিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি বলেছিলে। আমি শুনেছিলাম।'

'কি বলেছিলাম?'

কাকতাড়ুয়ার স্বর খুব ব্যথার খাদে কেঁপে গেল।

নন্দন বলল, 'তুমি বলেছিলে, আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম, হ্যাঁ, হব!'

'কি জানি। আমার ঠিক মনে আসছে না। ও, এই যে দেখছি এখানে একটা মাকড়সার জালের সুতো ছিঁড়ে গেছে।'

'কাকতাড়ুয়া কাকাতাড়ুয়া এসব তুমি কি বলছো?'

'আমার মাথার ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলোর সম্পর্কে বলছি। সমস্তই সজীব প্রাণের নির্মাণ! তারই একটা ড্যামেজ হয়েছে।'

'আরে বাস্, তুমি যে ইংরিজী শব্দ বলছ কাকতাড়ুয়া!'

'আমার যে ইংরিজী নামটা আমি জেনে গেছি।'

'কি তোমার ইংরিজী নাম?'

'স্কোয়ার ক্রো!'

একটা বাঁদর ঠিক এই সময়ে খিদে আর তার সামনে খাবারের মাঝখানের ভয়টয় সব ভুলে গিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল বেগুন খেতের উপর। নন্দন লাফিয়ে উঠে চিৎকার করল বাঁদর তাড়ার প্রচলিত ভাষায়, 'লোহা লো—হা, লোওহাআ···

মাটি থেকে তুলে নিল একটা নরম ঢেলা।

বীর হনুমান ততখনে দু'বগলে দুই বেগুন ঢুকিয়ে বেড়ার উপর লাফিয়ে উঠেছে।

নন্দন হাতের মাটির ঢিল তার দিকে ছুঁড়ল। কিন্তু সেটা মাঝপথ না যেতে যেতে ধূলোগুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল। বাঁদর সেটা লক্ষ্য করে নন্দনকে দাঁত ভেংচে দিল।

রেগে গিয়ে নন্দন শূন্যে মুঠো ছুঁড়তে ছুঁড়তে হনুমানটায় দিকে

ছুটে গেল। কিন্তু হনুমান নির্বিকারে একটা বেগুনে কামড় বসালো। তারপর ধীরে সুস্থে লেজ বাঁকিয়ে নেমে পড়ল বেড়ার ওপারে।

হাঁফাতে হাঁফাতে নন্দন ফিরে এল কাকতাড়ুয়ার কাছে। বলল, 'দেখলে তো ব্যাপারটা?'

কাকতাড়ুয়া বলল, 'গোদা পায়ে লাথি!'

তার মানে?

'দেখলে তো নিজের চোখে। আরে আমি না হয় একটা মিথ্যে, সাজানো ভয়। কিন্তু তুমি? তুমি তো রয়েছ। তোমাকে-ও মানলো না। তার মানে, খিদের জন্যে জীব ভয়কে মানে না। তাকে দাঁত খাম্‌চে তুচ্ছ করে অমনি করে চলে যায়। আর ভয়, তোমার মত মিথ্যে, অকেজো হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ।' নন্দন মাথা নাড়িয়ে ভাবনার গলায় বলল, 'বাবা তাই বলছিলো, এবার সত্যিকারের একটা মাঠ কোটাল রাখবে।'

'মাঠ কোটাল! সে কি যন্ত্র?' কাকতাড়ুয়া গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল। নন্দন বলল, 'একটা মানুষ। মানুষ পাহারাদার। সে ছুটে গিয়ে তাড়াতে পারবে। টিন বাজিয়ে দিতে পারবে।'

'না। সে ক্ষমতা আমার নেই।' কাকতাড়ুয়া অতি বিনীত ভাবে তার চাকরী না থাকার স্বপক্ষে বলল, 'সত্যিই আমি একটা কিছু না। অকেজো। ফালতু।' 'কাকতাড়ুয়া।'

'নন্দন বাড়ী যাও। সন্ধ্যে নামল।'

'কাকতাড়ুয়া।'

'বাড়ী যাও নন্দন। অন্ধকারের রাত। এখানে আর থেকো না।'

হঠাৎ নন্দনের চোখে পড়ল একটা সাপ কাশ ঝোপের ভেতর পাক খেয়ে ঢুকে যাচ্ছে।

চলছে কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ এখন পৃথিবীর অন্য দিকে আলো দেবার কাজে বুঝি ব্যস্ত। শুধু তারারা উঠে থাকে। কেউ কেউ সরে যায় কিন্তু অনেকে স্থির জায়গায় দাঁড়িয়ে বাতিঘরের মত আলো ছোঁড়ে। পরিষ্কার আকাশ থেকে হিম ঝরে কাকতাড়ুয়ার মাথার

উপরে। ভেতরে ঝিঁঝিঁর শব্দ সঙ্গীত আসরের আরম্ভে বেহালায় যেন তার বাঁধা হতে থাকে। কাকতাড়ুয়ার মনে হয়েছে আজ বেহাগে বাজবে বিষন্ন ব্যথা তারই আয়োজন চলছে। বিষে মরেছে খোলা মাঠের পোকা মাকড়। তার মাথার ভেতর আশ্রিতরা কয়েকদিন সামান্য অসুস্থ ছিল। এখন সবাই ভালো আছে। তবে মনে আছে মৃত্যু ভয়ের আতঙ্ক।

কাকতাড়ুয়া এইসব বিষয়গুলোয় মগ্ন ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে জেগে উঠতে হ'ল। তার মুখে পড়ল সরু ফোকাশের বেশ জোরালো একটা টর্চের আলো। আর তার সঙ্গে শুনতে পেল, 'এই যে, বলি চিনতে টিনতে পারছ না কি হে? এ্যাহ্, পাহারাদার। ওরে আমার পাহারাদার। সেদিন তুমি আমাকে সাবধান হতে বলেছিলে। ভেবেছ কি, শুনি নি? এই এবার এক মুঠোতে যদি তোর মুণ্ডুটা ছাতুফুটো করে দি, তাহলে কি হয়?'

লোকটা একটু থামলো। তারপর আবার বলল, 'কিন্তু আমি তা করব না। তুই শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্ আমরা কি করি!'

কাকতাড়ুয়া এবার দেখলো লোকটা একা নয়। পাঁচটা জ্যান্ত অন্ধকার কলার কাঁদি কচাকচ্ কেটে ফেলল। গাছ ফাঁকা করে বেগুনগুলো বস্তা বন্দী করল। তারপর যা আরম্ভ করল সে দৃশ্যে কাকতাড়ুয়াকে সত্যিই একটা মিথ্যে, জড়বস্তু, ভয় সাজা ভাঁড় বলে মনে হ'ল। এবং সে বোবা হয়ে গেল। শুধু বোবা নয়, কানা!

সকালে হরিসাধন মোড়ল তরি-বাড়ীতে ঢুকে একেবারে যেন কুঁজো বুড়ো হয়ে গেলেন। মড়ার মত অপলক চোখ। মুখের হাঁ। হাত দু'খানা মুঠোয় শূন্যে ধরতে গিয়ে না পেয়ে থমকে যাবার ভঙ্গিতে তোলা। ফসল লোপাট হয়ে গেছে সব। শুধু তাই নয় ফসলের সব গাছ শেকড় উপড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে দূরে দূরে।

এই দৃশ্যের হতবাক অবস্থা কাটিয়ে হরিসাধন মোড়ল এক সময় চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে নদা, আয়রে, ছুটে আয়, নদারে, দেখে

যা আমাদের তরি-বাড়ীর কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে। কাকে কি বলা যায়!'

ঘরটা একটু দূরে। তেঁতুল গাছটার ওপাশে।

তবু শব্দ গেল। নন্দন ছুটে এলো। এলো ঘরের মানুষ ও পাড়া প্রতিবেশী। দেখলো সবাই একটা সবুজ মাঠের ছেঁড়া কাটা শরীর। কলাগাছগুলো দা-কাটা। পেঁপের মাথা মুচড়ে ভাঙা। সীম লতা খণ্ড বিখণ্ড। মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে কুমড়ো লাউ লতাদের ছেঁড়া কাটা শরীর!

দর্শকদের মধ্যে একজন বললেন,'হরি মোড়ল, এ তোমার শত্তুরদের কাজ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

শত্তুর! বাঘের মত হাঁকড়ালেন হরিসাধন মোড়ল।

'হ্যাঁ। ওই জমির মালিক রায়েদের কাজ এটা। আসলে ওরা ভেবেছিল, তোমার শাস্তি হ'বে। কিন্তু হ'ল না। বেকসুর খালাস পেয়ে গেলে। সেই রাগ।' 'হুঁউউ' হরিসাধন যেন দম ধরলেন। ফুলে উঠল তার শক্ত শরীর। বুকের পেশী, হাতের শিরা!

রাজেন ঘোষ বয়স্ক মানুষ। তিনি দলের মধ্যে থেকে বললেন, 'আসলে সত্যিই তো তুমি নির্দ্দোষী। তোমার লাঠিতে তো রায়দের ছেলের মাথা ফাটে নি। তুমি লাঠি তুলেছিলে ঠিকই। কিন্তু ভয়ে, আরে আমি তো পাশের জমিতে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছি, ছেলেটা ভয়ে নিজে নিজেই পড়ে গেল মাঠের আলে। সেখানে ছিল খুব বড় একটা পাথর। তার ধাক্কায় ওর মাথাটা গেল ফেটে। সে সাক্ষী তো আমি নিজের মুখে, কোর্টে, জজসাহেবের কাছে দিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু ছেলেটা মরে গিয়েই তো হ'ল মুশকিল।' কে একজন বলল, 'ওরা এবার হাইকোর্ট করবে বলছে।'

'কিন্তু ছেলেটা তো হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে ফিরেছিল। তবু হঠাৎ মরে গেল কি করে? 'কে জানে!,

'হাইকোর্ট হাইকোর্ট!' হরিসাধনের গলায় যেন ভূমিকম্পের

আওয়াজ উঠল। তিনি চিৎকার করে বললেন, শালা, গাছের প্রাণ মেরে হাইকোর্ট! ঠিক আছে! সেবার হাতে ছিল গাছের ডাল। এবার থাকবে তরোয়াল। দেখি কি হয়!'

যেন একটা খেপা মোষ, এমনি ভাবে লাফিয়ে উঠে তিনি ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলেন।

নন্দন চিৎকার করল, 'বাবা বাবা।'

অন্যরা বলল, 'আরে, ধর ধর। রেগে গেলে মোড়লের মাথার ঠিক থাকে না।'

এই পরিবেশে কাকতাড়ুয়াও যেন বলতে চাইল, 'হরিসাধন মোড়ল, মোড়ল মশায়, মাথা গরম করবেন না। একটু শান্ত হউন।'

কিন্তু তার স্বর ফুটল না। চিৎকার করতে করতে সবাই ছুটে গেল হরিসাধনের পেছনে। দূরে গেল শব্দ। একা হয়ে গেল কাকতাড়ুয়া। সংসার তার তছনচ। মানুষেরা ছুটছে হৈ হৈ শব্দ তুলে কি অঘটন ঘটাতে! সে শব্দ কাছে আসছে। দূরে যাচ্ছে। কিন্তু ভাষা কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

এমন হয় না, কথাটা কি মনে পড়ছে না কিন্তু মনে হচ্ছে একটা কথা আছে। কাকতাড়ুয়ার মাথার মাটির খুলির অণুতে পরমাণুতে তেমনি যেন মাইক্রোফিলিম করে কি একটা রাখা আছে। জীবের লড়াই প্রবৃত্তির পরিণাম! একবার লেগে গেলে তো আর দিকবিদিক জ্ঞান নেই। শান্ত নিরীহ দু'টো গরুতে হঠাৎ সেদিন লড়াই লেগেছিল তার সামনের মাঠটায়। কারণ জানে না কাকতাড়ুয়া। শুধু দেখেছিল, একজন কঠিন আহত ও অন্যজন নিহত হয়ে পড়েছিল।

এইসব স্মৃতির সাময়িক কারণে প্রজেকশান, তাকে চমক দিল।

কাকতাড়ুয়া দেখলো সাদায় কালোয় ছাপা একটা অদ্ভুত সুন্দর, ছোট্ট এক ছাগল ছানা তাকে দেখে দারুণ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

'ম্যা-এ-এ-এ!'

'আরে সোনা!' কাকতাড়ুয়া তাকে আদর করে বলল, 'আমাকে ভয় পেয়েছ! কিন্তু আমি যে কিছুই না।' ও ঠিক বুঝবে কি বুঝবে

না ভেবে সেই গোদা পায়ের লাথি' প্রবাদটা ব্যবহার করল না!

ছাগল ছানা চার পা ফাঁক করে, লেজ বাঁকিয়ে থির চোখে দাঁড়িয়ে বলল, 'ম্যাএ-এ।'

'কি বলছ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কাকতাড়ুয়ার ছাগলের সঙ্গে কথা বলার কোনো আগের ঘটনা নেই। তাই ভাষা বুঝতে মনোযোগী হওয়ার জন্যে সে বলল, 'ঠিক আছে আমি আবার বলছি, আমাকে কি তুমি ভয় পেয়েছো?'

'কৈ না তো।'

কাকতাড়ুয়া ছাগলের শব্দের অর্থময় ভাষা বুঝে গেল। সে বলল, তাহ'লে বেশ শোনো, তোমাকে একটা কথা শুধোই।'

গেট খোলা। অনেকগুলো ছাগল এই তরি-বাড়ীর লোভের স্বর্গটায় ঢুকে পড়েছে। তারা শুঁকে শুঁকে হতাশ হয়েছে এতো পাতার কোথাও নেই টাটকা রসের সবুজ গন্ধ! তবু তারা খাচ্ছে যা পাচ্ছে। আর থেকে থেকে দু'এক জন ডেকে উঠছে।

'এই কোথায় গেলি?'

'এখানে অনেক ঢেঁড়স রয়েছে।'

'উমমা উমা।'

বাচ্চাটিকে ডাকছে মা:

কাকতাড়ুয়া ঝটপট কথা বলল, 'আচ্ছা তুমি তো গাঁ ভেতর থেকে আসছো। ওখানে কিছু কি হচ্ছে?'

'ম্যা-এ-এ।'

'ও, তুমি কিছু জানো না। তাহলে ঘাস খাও!'

ছাগল ছানাটি লাফিয়ে ছুটে মায়ের কাছে চলে গেল।

কিন্তু নিষিদ্ধ এলাকায় ছাগলের এমন মহৎ প্রবেশ দেখে একটা পথ কুকুর গেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব জোরে শাসন আরম্ভ করল।

'ঘেউ ঘেউ। বেরিয়ে যাও। ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ। যাও, যাও বলছি!'

'ও ভাই বীরপুরুষ!' কাকতাড়ুয়া জোরে শব্দ ছুঁড়লো

ভেন্ট্রিলোকিজিমের সাহায্যে কুকুরের কানে ও মনে যে কুকুর হঠাৎ চুপ করে গেল।

কাকতাড়ুয়া বলল, 'শোনো শোনো, এদিকে আমার কাছে এসো।'

কুকুর হঠাৎ মাথার মধ্যে এই আদেশ ধ্বনিত হতে শুনে লেজ নাড়িয়ে চলে এলো কাকতাড়ুয়ার সামনে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে কুকুর বলল, 'ভুক্ ভুক্।'

কাকতাড়ুয়ার খুব জোর একটা হাসি পেল। সে হাসতে হাসতে বলল, 'বাহ্, বাহ্, বেশ শুধিয়েছ তুমি। আমি মানুষ না টানুষ? হা হা হো হো হি হি।'

ইট রঙা কুকুরটি ভ্রু কুঁচকে কাকতাড়ুয়ার দিকে চেয়ে থাকলো।

হাসি থামিয়ে কাকতাড়ুয়া বলল, 'আমি টানুষ, কুকুর আমি একটা টানুষ! কিন্তু শোনো, তোমাকে যে জন্যে ডাকলাম।'

'বল বল।'

'ওই শুনতে পাচ্ছ, মধুকুপি গাঁয়ের ভেতর কি জোর গোলমাল উঠছে।'

কুকুর কান খাড়া করে বলল, 'তাইতো।'

'ওখানে, ওখানে কি হচ্ছে তুমি আমাকে বলতে পার হে প্রহরী।'

প্রহরী ডাক কুকুরের খুব ভাল লাগলো। সে ছটপট করে বলল, 'বলতে পারি না। তবে সেটা জেনে এসে আমি তোমাকে শোনাতে পারি।'

একটা কাক গাঁয়ের মাথার আকাশের উঁচুতে উড়ে চেচাচ্ছে, 'কা কা।' কাকচরিত পড়া বিদ্যায় কাকতাড়ুয়া বুঝল স্বরটা বিপদের সম্ভাবনার!

কিন্তু কি বিপদ? কি ধরনের ঘটনা ওই শব্দে ঘটছে যা থেকে থেকে উঠছে আর থেমে যাচ্ছে! এসব জানবার জন্যে কাকতাড়ুয়ার ভেতর ব্যাকুলতা জাগলো। কুকুর হঠাৎ এই অবসরে একটা ঠ্যাং তুলে কাকতাড়ুয়ার গায়ে ছড়্ ছড়্ করে পেচ্ছাব করে দিলে।

আর একদিকের বেড়ার উপর একটা বীর বাঁদর উঠে বসে শব্দ করল উঁপ্ ।'

'কি বললে ?' কাকতাড়ুয়া চমকে উঠে তার দিকে তাকালো। বলল, তুমি আমাকে বলবে ?'

হ্যাঁ। আমি এইমাত্র দেখে এলাম। মাটিতে কতকগুলো জ্ঞানী প্রাণী হৈ হৈ করছিল। আমি গাছের ডাল থেকে শুনছিলাম।,

একটি বাচ্চা বাঁদর তার পাশে উঠে এসে বসল। তারপর বীরটির খ্যাঁকর খ্যাঁক' ভাষায় কথা বলার দিকে তাকিয়ে নিজের বাঁদিকের পাঁজরের লোম খাম্‌চাতে লাগল জোরে জোরে।

সেই হঠাৎ চমকে ওঠাটাই যেন কাকতাড়ুয়ার মস্তিষ্কের কোনো কোষে বাঁদর ভাষায় অনুবাদ চলাচল করিয়ে দিতে লাগল। এমনভাবে কাকতাড়ুয়া নিবিষ্ট মনে বাঁদরের কথায় কান রাখল। কুকুরটা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁদর দেখলে কুকুরের কাজ তাকে তাড়া করে পগার পার করে দেওয়া। কিন্তু এই কুকুর বাঁদরে সহাবস্থান কদাচিৎ হয়! মনের একতলে জলস্রোতের মত এই রকম ভাবনা নিয়ে তাকিয়ে থাকলো কাকতাড়ুয়া বাঁদরের দিকে।

সে কথা বলল, 'গাঁয়ের ভেতর এখন খুব উত্তেজনা। কখন কি হয় বলা যায় না ?'

'কেন ? কেন ?' কাকতাড়ুয়ার হাতের আঙ্গুল গুলো কাঁপল থর থর করে। বলল, 'আমাকে বল। আমাকে বল।

বাঁদর গম্ভীর গলায় বলল, 'খুন হয়েছে একটি জ্ঞানী প্রাণী।'

জ্ঞানী প্রাণী !

কাকতাড়ুয়া ভয়ঙ্কর বোকার মত বোবা হয়ে গেল।

কুকুরটা খুব আস্তে আস্তে শব্দ করল, 'ভুক্।'

একটা ছাগল কি কারণে হঠাৎ আর্তনাদ করল, 'এম্যা এ এ !'

বাচ্চা বাঁদরটা চুলকুনি থামিয়ে চুপ করে বসে গেছে।

কাকতাড়ুয়া কথা বলল, 'জ্ঞানী প্রাণী তো মানুষেরা। তা মানুষদের প্রত্যেকের সব আলাদা আলাদা নাম থাকে। শুধু জ্ঞানী

প্রাণী বললে তো চলবে না। মানুষটার নাম বলতে হ'বে। কি নাম তার ?'

'জানি না।'

'ও। আর তুমি কি দেখলে ?'

'দেখলাম খুন করে এক জ্ঞানী প্রাণী ছুটে পালালো তার হাতের কুড়ুল খানা নিয়ে।'

'কোন্ দিকে গেল ?'

'একটা পুকুরের দিকে।'

'তারপর ?'

'পুকুরের জলে সেই রক্ত মাখা কুড়ুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।'

'তারপর ?'

'আর জানি না।'

'ঠিক আছে। আমি সব জেনে আসছি।'

কুকুর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে গেট পেরিয়ে জোর ছুট্ মারল।

আর ছাগলগুলো হঠাৎ হুটোপুটি করে বেরিয়ে চলে যাবার জন্যে দৌড়ল। কেন কে জানে।

থাকলো শুধু রোদ বাতস আর চুপচাপ বসে বাঁদর দু'টো। ওরা কি কুকুরের খবর শোনবার জন্যে বসে আছে ?' কাকতাড়ুয়া জান না। শুধু শুধালো মধুকুপির মানুষ বসত থেকে এখন আর কোনো শব্দ নেই। কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতর ঢুকে গেছে এক পাহুরে পোকা। বিকট গন্ধ তার গা থেকে উঠে বাতাস ভারি করে তুলেছে।

এই সময় বাঁদর আবার কথা বলল, 'তুমি তো জানই, মানুষদের পূর্বপুরুষ ছিল আমাদের মতই এক ধরণের জীব !'

কাকাতাড়ুয়াব কথা কইতে ভাল লাগছে না। সে বলল' 'হ'বে হয়তো।'

'আরে হয়তো কি ! তাই ! আমার নিজেদের বংশধর কে চিনব না এটা কখনো হয়। তাই আমি বলছি আমাদের বংশধরেরা যে খুব একটা উন্নত হয়েছে তা আমি বলতে পারব না।'

কেন ?, কাকতাড়ুয়া হাল্কা করে প্রশ্নটা করল।

বাঁদর বলল, 'এইজন্যে যে ওদের মনের ভেতরটায় অনেক মাকড়সা, উইপোকা, ইঁদুরের বেড়ালের প্রবৃত্তি ঢুকে আছে। খ্যাঁক খ্যাক। বুঝেছো কিছু না. জড়ভরত হয়ে বসেই আছ ?'

'বসে নেই হে মানুষের পূর্বপুরুষ!' কাকতাড়ুয়া একটু ঠাট্টা করে বলল, 'আমি এই মাঠে দিনরাত দাঁড়িয়ে আছি!'

বাঁদর হঠাৎ বেড়ার উপর সামনের দু'হাতকে পায়ের কাজে লাগিয়ে উঠল, 'তোমার আবার বসা দাঁড়ানো। ফুউহ। সেই বলে বা "অন্ধ জাগো" তো অন্ধের আবার দিনরাত। চলি। এখানে তো তোমার সব গেছে। খাবার জিনিস কিছুই নেই। গাছপালা পচতে আরম্ভ করেছে। এরপর দেখো রাত হ'লে ভাগাড়ের মত পচা গন্ধ ছাড়বে।'

বাঁদর ফিরে তাকালো বাচ্চাটির দিকে। বলল, 'চল রে মুন্নি, অন্য কোথাও যাই।'

ঝপাৎ করে বেড়ার ওধারের মাটিতে নামলো হনুমান। তার সঙ্গে বাচ্চাটা। হাতে পায়ে মিলিয়ে ওরা ছুটে চলল মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আর একটা গাঁয়ের দিকে। সেখানেও মানুষের বসত। এমনি কত গ্রাম ঘিরে আসছে সবুজ সমুদ্র হয়ে। তার মাঝে মাঝে ধানের শিষে অজস্র ফুল! কিন্তু আকাশটা ?

কাকতাড়ুয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কি রকম ভয় পেল। দেখলো চারদিকের দিগন্ত থেকে চাপ চাপ কুয়াশা উঠে এসে সব কিছু আড়াল করে দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে না কোথায় কি। এমন এক কালো রাত জড়িয়ে ধরল কাকতাড়ুয়ার চারপাশ। শুধু তার মাথায় ভেতরে ভেসে উঠল প্রভাতীর টিয়া পাখীটি। খাঁচায় বসে ঝিমুচ্ছে। কিন্তু একদিন সে প্রভাতীর সঙ্গে দেখা হ'লে অবিকল মানুষের গলায় তার নাম ধরে ডাকতো। এখন আর ডাকে না। মাথাটি ঝুঁকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। দেখেছে তার হাঁড়ি জীবনের বিষাদ পর্বের দিনে!

মা তাকে খেতে দিতে এসে বললেন, 'বল্, একবার প্রভাতী বলে ডাক্...তুই, তাকে একেবারে ভুলে গেলি রে। তার নাম ধরে আর ডাকিস্ না?' টিয়া খায় দু'এক টুকরো ভিজে ছোলা। তারপর দাঁড়ের কোনায় সরে বসে!

নন্দনের রয়েছে জালে বন্দী কতকগুলি খরগোস। তারা বেশ সুখে থাকে। প্রাণ ভরে দুর্বা ঘাস খায়। তাদিকে দেখে ফেলে কাকতাড়ুয়া। মা বাবা বাচ্চারা মিলে কাঠের বাক্সে তারা এক সুখী পরিবার।

এবার হরিসাধন মোড়লের ঘর-গোয়াল সব একসঙ্গে দৃশ্যমান হয় কাকতাড়ুয়ার মাথার ভেতর। প্রথমেই চোখে পড়ে প্রভাতীর ঘর। কিন্তু মুহূর্তে মনে হয়, সে ঘরের চেহারা এখন পাল্টে গেছে। ওখানে হয়তো মা শোন্। নন্দন শোয় তার পাশে! এখন বুঝি সে ঘুমুচ্ছে?

কিন্তু এখনকার খবর তার ঠিক জানা নেই। তাই ওই ঘর মুছে যায়! এবং সেখানে আর কিছু যেন আসতে চায় না! শুধু চাপ বেঁধে থাকে তারা হারা একটা আকাশ আর অন্ধকারের হিজিবিজি কিছু মূর্তির মত অজানা উদ্বেগ। কাকতাড়ুয়ার নিজের মাথাটাকে নিজেরই খুউব ভারি লাগতে থাকে। আর ঠিক সেই সময় তেঁতুল গাছটার ওপারের আকাশের থেকে ভেসে আসে একদল কাকের ভয়ঙ্কর চিৎকার, 'কা কা কা!'

কাকাতাড়ুয়া দেখল, ওই দিকে যেখানে হরিসাধনের ঘর সংসার সে দিক থেকে ধোঁয়া উগড়ে উঠছে লাল হল্কায়।

চিৎকার করছে কাকেরা, 'সামাল সামাল। কা কা কা।'

'কা কা কা। কি করা যায়, কি করা যায়'

'দূরে থাক্। কা কাক্।'

'পালিয়ে যা। ক্যাক্ কে-এ। দেখছিস না সব পুড়ে ছাই হচ্ছে।'

'পুড়ে ছাই!'

কাকতাড়ুয়া হঠাৎ লম্বা হতে শুরু করল। তার মাথাটা উঠে

গেল উঁচুতে। ঠেকল গিয়ে মেঘে। কিন্তু এ কি মেঘ? এ যে শুধু ধোঁয়ার বোঝা। এতে কোথাও কণা জল নেই! কাকতাড়ুয়া দুহাতে সেই মেঘ জড়ো করে তাদের নাড়িয়ে না দিতে চাইল আগুনের উপর। যেখানে আলকাতারা মাখা টিন আগুনের এক একখানা চাদর হয়ে উড়ে যাচ্ছে। দাউ দাউ করছে পুড়ছে ধানের মড়াই, খড়ের পালুই, ঘুমন্ত নন্দন ঘরের ভেতর মায়ের সঙ্গে খিল্ দিয়ে।

কাকতাড়ুয়া মেঘগুলোকে নিংড়ে ফেলল দু'হাতের শক্তিতে। কিন্তু এক ফোঁটা জল সে কোনো ভাবেই সেই অগ্নিকাণ্ডের উপর ফেলতে পারল না। আসলে সে পারে না। তার কোনো ক্ষমতা নেই। শুধু ইচ্ছে। আর ইচ্ছের পরিণাম জেনে, সে একই থাকল। চার ফুট লম্বা বাঁশের আগায় হাঁড়ি মাথা। একটা আড়াআড়ি বাঁশের দুই হাত। গায়ে ঢোলক জমা। পায়ের নীচে বিশাল শর ঝোঁপ।

কতখন পর আগুনের শিখা নিভেছিল? হৈ হৈ শব্দে কতখন ভরেছিল এই রাতের আকাশটা? জানে না, কাকতাড়ুয়া। শুধু এখন সব শান্ত। ঝিম্ ঝিম্ করছে ঘন রাতের পরিবেশ! বাতাস থমকে আছে। উপ্‌ড়ানো গাছেদের মরা শরীর পচে বিকট গন্ধ ছাড়ছে! যেন মনে হচ্ছে, কোনো এক মহাপ্রলয়ে মরা শরীরগুলো পচছে শুধু পচছে। বিষাক্ত হয়ে উঠছে বাতাস!

ঠিক তখনি সে শুনল কানের ফুটোর কাছে নন্দনের গলা, 'কাকতাড়ুয়া কাকতাড়ুয়া।'

'কে? বুঝে ও কাকতাড়ুয়ার মুখ দিয়ে এরকম প্রশ্ন বেরিয়ে এলো।

'আমি নন্দন।

কি হয়েছে নন্দন, এতো হাঁপাচ্ছ কেন?'

'কাকতাড়ুয়া!

'ভয়ে তোমার গলা কাঁপছে নন্দন। কি হয়েছে আমাকে তাড়াতাড়ি বল।' 'ওরা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে কাকতাড়ুয়া।

তুমি আমাকে বাঁচাও।'

নন্দন সেই অন্ধকার রাতের আরো অন্ধকারে পেছন দিকে বার বার তাকাচ্ছে।

কাকতাড়ুয়ার চোখে বা বোধে কিছু আসছে না। সে 'বলল, কারা? কেন তোমাকে মেরে ফেলবে? ঘটনাটা কি হ'ল?'

'অত বলবার সময় নেই কাকতাড়ুয়া, ওই গোলমাল শুনতে পাচ্ছ! ওরা আমার বাবার গলা কেটে ফেলেছে। মায়ের আর পিসির মাথা ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছে। তারপর আমাকে খুঁজছে। পায় নি। শেষে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাকতাড়ুয়া, আমি পালিয়ে এসেছি। আমাকে কোনো ভাবে তুমি বাঁচাও।'

সেই শুকনো মেঘখানার নীচে আরো মেঘ এসে জমে যাচ্ছে। গ্রামের ভেতর থেকে শব্দ তীর বেগে ছুটে আসছে। তার মধ্যে কতগুলো গলায় কথা—'আমি দেখেছি ছুটে পালাতে।'

'কোথায়? কোন্ দিকে?'

তরি বাড়ীর অন্ধকারে টর্চের তরোয়াল কেটে ঢুকে গেল।

পেছন থেকে শব্দ এল, 'এই, এই দিকে ছোঁড়াটা এসেছে। সব ঝাড়েবংশে শেষ করে দেবো।'

'হ্যাঁ। তারপর আগুন লাগা কেস বলে চালিয়ে দেবো।'

'চল, ভেতরে ঢুকি। ওখানেই ওকে শেষ করব।'

পা টিপে টিপে ঢুকছে মৃত্যুর অন্ধকার। তারা কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে, 'আচ্ছা, আমাদের সেই লোকটি, যাকে ও কুড়ুলের বাঁট দিয়ে মেরেছিল, কেমন আছে বলতো?'

'ভালো আছে। কিন্তু জায়গাটা দেখছি খুব অন্ধকার। আসলে পিঠে কাঠের বাঁটের ঘা টা জোর লেগেছিল। কিন্তু কথা তো সেটা নয়। হট্ করতেই বেটা বেজাতের চাষা—'

'বেজাতের চাষা মানে?'

'আরে জানো না বুঝি তুমি। বেটা ছিল জাতে হাড়ি। তারপর

বোস্টম হ'ল। শেষে চাষী। তো সেই আমাদের উপর লাঠি তুলবে, কুড়ুল মারবে এ কাঁহাতক্ সওয়া যায়। তাই চাই চরম শাস্তি দেওয়া '

জোরালো টর্চের আলো ঘুরে গেল গেল নন্দনের কাছাকাছি দিকে। নন্দন কাকতাড়ুয়ার গায়ে সিঁট্কে দাঁড়িয়ে তার কানের উপর ঠোঁট রেখে বলল, 'ওরা এসে গেল কাকতাড়ুয়া। বল এখন আমি কি করি?'

'ঢুকে পড়। আমার জামার তলায় তুমি ঢুকে পড় নন্দন।'

'তারপর?'

'আহ্, সময় নষ্ট করো না। ওই শরঝোপের পাশে আমার জামার ফাঁকে ঢুকে পড় আগে।'

নন্দন ঢুকে গেল।

'এবার সোজা হয়ে দাঁড়াও।'

'পারছি না! তোমার গলার ফুটোটার চাইতে আমার মাথাটা বড়। ঢুকছে না। 'না ঢুকুক্। হাঁটু ভেঙে বসে তোমার মাথাটা আমার শরীরে ছুঁইয়ে চুপ করে থাকো। ওরা এসে গেছে।'

'কৈ কৈ কোথায়?'

খুব কাছে শোনা গেল ওদের একজনের গলা।

'কোথাও তো দেখছি না।'

'যাবে কোথায়! এখানেই আছে।'

আলোর ঝলক ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখছে অন্ধকার। কাকতাড়ুয়ার উপর এসে পড়ল জোর ছটা।

'আরে ওই তো!

'না ওটা একটা কাকতাড়ুয়া।'

'ওর ভেতর ঢুকে আছে।'

'আরে ধুত্, আমি বলছি এখানে নেই। ও গাঁয়েই কোথাও লুকিয়েছি।'

নন্দন কাকতাড়ুয়ার ভেতরের খুঁটিটা শক্ত করে চেপে ধরেছে।

সে থর থর করে কাঁপছে। তার ফলে নড়ছে কাকতাড়ুয়ার মাথা। কাকতাড়ুয়া বলল, 'আস্তে আস্তে। অত কেঁপো না নন্দন। তাহ'লে বিপদ ঘটবে।'

'অসম্ভব। তুমি ভুল বলছ। আমি দেখেছি। চল, ওটার কাছে যাই।'

এগিয়ে এল দলটা। হিসেব পাওয়া গেল না জনসংখ্যার। ঘিরে দাঁড়ালো সবাই মিলে।

অনেক গুলো টর্চের ফোকাশ পড়ল কাকতাড়ুয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কথা শোনা গেল, 'না এখানে নেই।'

'কি করে বুঝলে?'

'এই দেখ, হাঁড়ির ফুটো। তার ভেতরে টর্চ মেরে দেখলাম জায়গাটা মাকড়সার জালে ভর্তি। ওখানে কেউ লুকিয়ে নেই।

'দেখ। আমি বলেছিলাম। চল, গাঁয়ের দিকে খোঁজা যাক্।'

আরে ওই দিকে, ওই দিকে কি একটা নড়ে উঠল।'

পায়ের শব্দগুলো ছুটে গেল অন্য দিকে।

'নন্দন।' কাকতাড়ুয়া ডাকল।

নন্দন কতখন থেকে শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু হলে তার ফুসফুসটা ফেটে যেতো! সে শ্বাস নিল খুউব বড় করে কাকতাড়ুয়ার শরীর ভেতরের বাতাস টেনে। তারপর বলল, 'ওরা চলে গেছে?'

'এখান থেকে গেছে নন্দন। কিন্তু রয়েছে অন্যদিকে।'

'এদিকে আবার ফিরে আসবে?'

'জানি না নন্দন।'

কাকতাড়ুয়ার ভেতরে এতখন যত পোকারও গাছপচার গন্ধ নিথর হয়েছিল সেগুলো উড়ে যেতে লাগল নন্দনের চুলের গন্ধে। এতে যেন কাকতাড়ুয়ার সচেনতা বেড়ে গেল। তার মধ্যে জেগে উঠল এক দায়িত্ব বোধ। তার পদ মর্যাদার যোগ্য একটা কিছু করবার তীব্র ইচ্ছা ঘুর্ণিপাক তুললো কাকতাড়ুয়ার মাথার মধ্যে। সে তরল

ছড়িয়ে পড়ল দশদিকে।

অনুসন্ধানকারীদের গলা শোনা গেল, 'ধুত্ তেরি। একটা শেয়াল। ছুটে পালাল।'

'কিন্তু ও, ওটা কোথায় গেল?'

'তাইতো! এতো খুঁজছি তবু পাচ্ছি না।'

'আচ্ছা, তুমি ঠিক দেখেছিলে?'

'বলছি। দেখেছি। তবু—'

'ও। ঠিক আছে ঠিক আছে। চল ওদিকটা দেখি।'

'কাকতাড়ুয়া।' নন্দন চুপি চুপি বলল, 'ওরা কোন্ দিকে গেল?'

'এদিকে নয়।'

কিন্তু এদিকে যদি আসে?'

'আসবে না। আসতে পারে না।' কাকতাড়ুয়া স্থির গলায় বলল।

'কি করে জানলে?'

'জানি না।' কাকতাড়ুয়া ঊর্দ্ধদেশে মেঘের কাছে বেশী করে চন্দন ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল, 'তবে তুমি কিছু ভেবো না নন্দন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ওরা এখন কতদূরে কাকতাড়ুয়া?'

'বেশী দূরে নয়। তবে ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না। এটা ঠিক।'

'বেশ।' নন্দন স্বস্তির শ্বাস ফেলল। কিন্তু পরেই ভাবনার গলায় বলল, 'এখন না হয় খুঁজে পেল না। কিন্তু পরে—'

বললাম তো ওরা আর এদিকে আসবে না। একটু পর এখান থেকে চলে যাবে।'

'হ্যাঁ। আমি সেই কথাই বলছি।' নন্দন ফিস্‌ফিস করে বলে চলল, 'আমি তো পরে এক সময় এখান থেকে বেরুবো। কি, বেরুবো না কখনো?'

'না না। তাই কি হয়।' কাকতাড়ুয়া নন্দনের চুলের গন্ধ ইচ্ছে

করে আবার অনুভব করল। বলল, 'বেরুবে বই কি। নিশ্চয়ই বেরুবে।'

হ্যাঁ। চিরকাল তো এমন লুকিয়ে থাকা যাবে না কাকতাড়ুয়া।'

'সে তো নিশ্চয়ই।'

'তাহলে আমি কখন বেরুব?'

'কখন? মানে, সকাল হ'লে।'

'সকাল কখন হবে কাকতাড়ুয়া?'

নন্দন যেন কোন হৃত চেতনার থেকে কথা বলছে। সে বুঝলে, তার হত্যাকারীরা এখনো চারপাশে আঁতি পাতি খোঁজ চালাচ্ছে। তার গলার ফিস্‌ফিসে শব্দ ওদের কানে চলে যেতে পারে। সে জানে, এ রকম প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না। তবু সে আবার ব্যাকুল গলায় বলল, 'বল কাকতাড়ুয়া, কখন সকাল হবে?'

কাকতাড়ুয়া এখন অন্য কাজে গভীর মগ্ন। সে এখন তার সর্বশেষ শক্তির তরঙ্গগুলি পাঠাচ্ছে প্রকৃতির বিশাল প্রাণশক্তির কাছে। যেখানে নন্দনের রক্ষা পাবার সুপরিকল্পনা জমা আছে।

তাই সে নন্দনের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও প্রচলিত একটা উত্তর দিল, সূর্য উঠলেই সকাল হ'বে।'

'কিন্তু কাকতাড়ুয়া, তুমি শোনো, ভাল করে একটু শোনো—'

কাকতাড়ুয়া খানিকটা মন এদিকে এনে বলল, 'বল, কি বলছ আবার।'

সকাল হ'লে যখন বেরুব, তখন যদি ওরা আবার আমাকে ধরে?'

মেঘের তলায় মেঘ। তার তলায় মেঘ। ভয়ঙ্কর ভারি হয়ে ঝুলে পড়েছে এই ঘন স্তব্ধ পৃথিবীর দিকে। তাদের গায়ে এখন অজস্র জলকণা জমাট বেঁধে ঝরে পড়তে চাইছে। এ খবর কাকতাড়ুয়ার অদৃশ্য র‍্যাডারে ঘন ঘন ধরা পড়ছে। তার ছোঁড়া তরঙ্গগুলি এইসব বৃষ্টিকণাদের ধরে টান মারছে মাটির দিকে চুম্বকটানে।

কেননা এখানে, কাকতাড়ুয়ার মনে হ'ল—মনে হ'ল নয় তার চোখের সামনে স্পষ্ট হ'ল, একটা পাতা ঝরা গাছে একটি মাত্র

কিশলয় প্রবল বাতাসের ঝাপটায় কাঁপছে।

আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ উঠল ঝড়ের বাতাস। বিদ্যুৎ চমকে ফেটে গেল আকাশ। শব্দ হ'ল ভয়ঙ্কর জোরে। তারপর তীক্ষ্ণ ফলার বড় বড় জলের ফোঁটা নেমে এলো ঝড়ঝড় ঝড়বড় শব্দ করে।

যারা একটি কিশোর হত্যা করতে এসেছিল তারা এইভাবে চেঁচাল :

'আরি বাস্ শালা মেঘ রে!'

'চল চল বৃষ্টি এসে গেছে।'

'কিন্তু ছেলেটা—'

'আরে ধুত্ বলে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এখন মাথায় বাজ পড়ে মরি আর কি।' তখনই লোকটার চোখের সামনে ঝলসে উঠল বিদ্যুতের চাবুক। সে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, 'আ—আ।'

কি, কি হল কাকতাড়ুয়া? নন্দন শুধলো।

পৃথিবী ফাটিয়ে দেবার মত শব্দ উঠল। কাকতাড়ুয়া বলল, 'কিছুই হয় নি। একজন শুধু ভয় পেয়েছিল। এখন ওরা পালিয়েছে।'

'তারপর?'

কাকতাড়ুয়া, কাশঝাড়, বুনোলতা, নিমগাছ! এইখানে ঘন অন্ধকার। বৃষ্টি হচ্ছে অবিরল। দেখাচ্ছে যেন বিচ্ছিন্ন দেশ বা দ্বীপ। সেখানে একটি কিশোর এক কাকতাড়ুয়ার শরীরে মিশে গিয়ে শুনছে, 'বুঝলে নন্দন, সকাল হ'লে সূর্য উঠলে তুমি মানুষ পাবে। অনেক মানুষ। যারা তোমাকে বাঁচাবে, ভালবাসবে। তুমি তাদের কাছে চলে যাবে নন্দন। তোমার কোন ভয় নেই।

'আহ্ আহ্ কাকতাড়ুয়া। বন্ধু আমার।' নন্দন অমনি ভাবে তাকে আদর করে ডাকল।

কাকতাড়ুয়া গভীর শব্দে বৃষ্টির সুরে কথা মিশিয়ে বলল, 'আমি প্রভাতীকে ভালবাসতাম নন্দন। তুমি তার ভাই। তুমি আমার পরম আত্মীয়। তাই জানো, আজ বিষ্টি হওয়ার কথা ছিল না।

ছিল সমস্ত আকাশ ভরে শুকনো মেঘ। আমি হাত দিয়ে তাকে নিংড়ে ও এক ফোঁটা জল বের করতে পারি নি। নন্দন, পৃথিবীতে নদী আছে সমুদ্র আছে। আর আছে দেশে দেশে কত খাল-বিল-পুকুর-ডোবা। আমি তাদের কাছে খবর পাঠিয়ে, এই এত্তো মেঘ এনেছি নন্দন।'

'কি ভাবে খবর পাঠালে ?'

'কেন। অতি সহজে। যে ভাবে বেতারে বিদ্যুৎ তরঙ্গ চলে যায় শব্দ ছবি হয়ে, আকাশের এদিক থেকে ওদিকে। ঠিক তেমনিভাবে।'

'বাহ্। বেশতো। তাহলে কাকতাড়ুয়া, নন্দন উৎসাহের গলায় ভেতর থেকেই বলল, 'তুমি আমার একটা কথা অমনি করে একটু পাঠিয়ে দাও না।'

বল কি কথা !

'আমি একটু আশ্রয় চাই। আমি বাঁচতে চাই। তেমন মানুষ কে কোথায় আছ, আমাকে সাহায্য কর।'

বাহ্ বেশ কথা !, কাকতাড়ুয়া জোর উৎসাহের স্বরে বলল, 'এসো আমরা দুজনে একসঙ্গে এই কথাগুলো বলি। আসলে তোমাদের এক কবির লেখা থেকে বলতে চাই, আমি শুনেছিলাম, ভূধর কুম্ভকারের কিশোরী মেয়েটির কাছে। জানো, সে আমাকে অনেক কবিতা শুনিয়েছে। ঠিক আমাকে নয়। তোমারই বয়সী তার এক দাদাকে। আহা, তার দাদাটা ছিল, জানো, খুব রোগা। প্রায় অসুখে ভুগতো। তো যাকগে, সে কথা। এখন কবিতাটি বলি। কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জানি না তুমি পড়েছ কি না। না পড়লে আমার সঙ্গে বল।'

কাকতাড়ুয়া একটু থামল। আকাশের দিকে দিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কাকতাড়ুয়া কবিতা আরম্ভ করতেই নন্দন বুঝে গেল ওটা ওর জানা। তাই একসঙ্গে আরম্ভ করল সেই গানটাকে কথার মত করে বলতে। কাকতাড়ুয়াও সেইরকম করে বলে যাচ্ছিল, "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব। ঘোর কুটিল পন্থ তার। লোভ-

জটিল বন্ধ। নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী। কর ত্রাণ, মহাপ্রাণ। আন, অমৃতবাণী। বিকশিত কর, প্রেমপদ্ম। চির-মধুনিষ্যদ। শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূণ্য, করুণাঘন। ধরণী তল, কর কলঙ্কশূন্য।”

এইভাবে এক কাকতাড়ুয়া আর একটি কিশোর কণ্ঠের মিলিত স্বরে মিশে যেতে লাগল বিদ্যুৎ। মেঘের শব্দে ছড়িয়ে যেতে লাগলো দূরে দূরান্তে, মানুষের খোঁজে!

শেষ